বিখ্যাত গ্রন্থ *আল খিলাফাতু ওয়াল মুলক*-এর বাংলা অনুবাদ

খিলাফত ও রাজতন্ত্র

ইতিহাস ও পর্যালোচনা

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)

অনুবাদ : কামরুল হাসান নকীব

বই সম্পর্কে

রাসূল ﷺ বলেন—

'নবুয়তি খিলাফত ৩০ বছর থাকবে। তারপর আল্লাহ যাকে খুশি রাজত্ব দেবেন।' (মুসলিম : ১৮২১)

হিজরি একাদশ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন। এর ঠিক ৩০ বছর পর হিজরি ৪১ সনের জুমাদাল উলা মাসে হাসান ইবনে আলি (রা.) মুসলিমদের দুই সম্প্রদায়ের মাঝে সন্ধির জন্য শাসনভার থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তখন মুসলিমরা মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনাধীনে একত্রিত হয়। সুতরাং মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন রাজতন্ত্রের প্রথম পুরুষ।

রাসূল ﷺ বলেন—

'নবুয়তি খিলাফতের সাথে রহমত থাকবে। তারপর রাজা; তার সাথেও রহমত থাকবে। তারপর আসবে স্বেচ্ছাচারী রাজা। তারপর আসবে নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজা।' (মুজামুল আওসাত : ৬/৩৪৫)

'আমার পরে তোমাদের মধ্যকার জীবিতরা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহ আঁকড়ে থেকো। খুব মজবুতভাবে তা ধারণ করো। নবোদ্ভূত বিষয় বা বিদআত থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, প্রতিটা বিদআতই গোমরাহি।' (আবু দাউদ : ৪৬০৭, তিরমিজি : ২৬৭৬)

খিলাফত ও রাজতন্ত্র

ইতিহাস ও পর্যালোচনা

বিখ্যাত গ্রন্থ আল খিলাফাতু ওয়াল মুলক-এর বাংলা অনুবাদ

খিলাফত ও রাজতন্ত্র

ইতিহাস ও পর্যালোচনা

মূল | ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)
অনুবাদ | কামরুল হাসান নকীব

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা—১১০০
০২-৫৭১৬৩২১৪, ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
info@guardianpubs.com
www.guardianpubs.com

প্রথম প্রকাশ	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব	গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
আইএসবিএন	৯৭৮-৯৮৪-৯৬৪০২-০-২
ফিক্সড প্রাইস	১৯০ টাকা

প্রকাশকের কথা

খিলাফত!

আহা! শব্দটি শুনলেই কলিজায় টান লাগে, হৃদয়টা হাহাকার করে ওঠে। মুসলিম উম্মাহ কী এক অমূল্য রত্ন হারিয়ে ফেলেছে। প্রতিটি মুমিন হৃদয় আজও সেই হারানো সোনালি দিনগুলো ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে।

রাজতন্ত্র!

শব্দটি শুনলেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া সামনে আসে। অতিভক্তি কিংবা তীব্র প্রত্যাখ্যান। মুসলমানদের মধ্যেই একটা শ্রেণি রাজতন্ত্রকে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শাসন-পদ্ধতি হিসেবে উপস্থাপন করে, বিপরীতে আরেক শ্রেণি তীব্রভাবে রাজতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে খিলাফতকে একমাত্র ব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরে।

আসলে সত্যের কাছাকাছি কিছু কি আছে? আদতেই খিলাফত ও রাজতন্ত্র কি বিপরীত দুই মেরুতে অবস্থান করছে? প্রান্তিকতার মাঝে কিছু আছে কি না? ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রক্রিয়া ও কাঠামোগত বিন্যাস নিয়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে তুমুল বিতর্ক আছে। স্ব-স্ব চিন্তা-কাঠামোর অ্যাকাডেমিশিয়ানরা যুক্তি ও বাস্তবতা তুলে ধরে দুটোর ব্যাপারেই ওকালতি করেছেন। বলা বাহুল্য, আজতক চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তেই ঐকমত্যে পৌঁছা সম্ভব হয়নি, হয়তো ভবিষ্যতেও হবে না। তবে নির্মোহভাবে রাষ্ট্রচিন্তার পাঠ জানার পথ খুলে রাখা যায়।

শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এ ইস্যুতে আমাদের পথটা সহজ করে দিয়েছেন। তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম। অধিকাংশ চিন্তাধারার আলিমগণ তাঁর মতকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে বিবেচনা করেন। 'খিলাফত ও রাজতন্ত্র' শিরোনামে তিনি তাঁর বিদগ্ধ মত উপস্থাপন করেছেন 'মাজমুউল ফতোয়া' নামক সংকলনে। প্রিয় ভাই মুহতারাম কামরুল হাসান নকীব অত্যন্ত দক্ষ হাতে গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) লিখিত মূল কিতাবের নাম 'আল খিলাফাতু ওয়াল মুলক'। আমরা মূল নামের আক্ষরিক অনুবাদটাই রাখার চেষ্টা করেছি—'খিলাফত ও রাজতন্ত্র'। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লেখা এই গ্রন্থ পড়লে আজকের দিনে এসেও মনে হবে, যেন গতকালের লেখা পড়ছি! আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শাইখুল ইসলামকে রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন। সম্মানিত অনুবাদক গার্ডিয়ানের প্রতি আস্থা রাখায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আশা করছি, ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর এই গ্রন্থ পাঠের পর খিলাফত ও রাজতন্ত্র সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের তৃষ্ণা মেটাবে গ্রন্থটি—এই প্রত্যাশায়...

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

অনুবাদকের কথা

মুসলিম জাতির ইতিহাসের দুর্বিনীত সময় ও বিক্ষুব্ধ ঘটনাগুলো মুসলিমদের মনে ও জীবনে সর্বদা এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভারসাম্য বজায় রেখে সেই সময় ও ঘটনাকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করা এবং সঠিক শিক্ষাটা সেখান থেকে তুলে আনা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। যারা ইতিহাসের এই দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ সময়েও প্রয়োজনীয় ভারসাম্য বজায় রেখে এবং চিন্তার সংযত ও প্রজ্ঞার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে মানবজাতির সামনে প্রকৃত বিবরণ উপস্থাপন করতে পারে, সময় ও ইতিহাস তাদের সাথে অবিচার করে না।

তাই ইসলাম চিন্তার ভারসাম্য ও কর্মের পরিমিতিবোধে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কখনো কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষের কারণে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত থেকো না। সুবিচার করো; এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী।' সূরা মায়েদা : ৮

সাধারণভাবে ভারসাম্য রক্ষার এই আদেশ সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সকল ব্যক্তিই ন্যায়বিচার করবে, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। পাশাপাশি সকল মানুষকে বিচার করতে হবে ইনসাফের নিক্তিতে; এটা সকল মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। সেই বিবেচনায় সকল মানুষকে যদি ইনসাফের সাথে বিচার করা আবশ্যক হয়, তাহলে রাসূল ﷺ-এর ভাষায় যে মানুষগুলো সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন (অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম), তাঁদের বিচার বা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ভারসাম্য বা ইনসাফ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু—তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, তাঁরাই ছিলেন রাসূল ﷺ-এর আদর্শের একমাত্র বিশ্বস্ত সূত্র। তাঁদের বিষয়ে ভারসাম্যহীন আচরণ করা বা বেইনসাফি করার অর্থ হচ্ছে—ইসলামের ভেতর ভারসাম্যহীনতা ও অবিচারের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়া। তাঁরাই নববি আদর্শের একমাত্র বিশ্বস্ত সূত্র। তাঁদের বিশ্বস্ততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা মানে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।

তাই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মনীষী তথা সালাফগণ এই 'সর্বোত্তম মানুষ' তথা সাহাবায়ে কেরামের মূল্যায়ন বা বিচারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সাহাবিদের রাজ্যশাসন ও পারস্পরিক যুদ্ধ-সংঘাতের মতো

কঠিন বিষয়েও ভারসাম্যপূর্ণতার অনন্য নজির রেখেছেন। সালাফগণ কুরআন ও হাদিসের অতল ভান্ডার থেকে প্রমাণাদি হাজির করে ইতিহাসের সেই উত্তাল মুহূর্তগুলোর সঠিক বিবরণ এনে যথোপযুক্ত দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

অন্যদিকে ইতিহাসে এমন নজিরও প্রচুর রয়েছে, যেখানে লেখকগণ নিজেদের পাণ্ডিত্য ও মাহাত্ম্যের সাথে যথাযথ সুবিচার করতে সক্ষম হননি। সাহাবিদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিবাদ এবং তাঁদের ইতিহাস কিংবা খিলাফত ও রাজতন্ত্রের বিচার ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পূর্ণ ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি। যার ফলে সাহাবিদের মর্যাদাবিষয়ক আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের স্বীকৃত মত ও পথ থেকে তাদের বিপর্যয়কর পদচ্যুতি ঘটেছে। এমন গবেষকদের সারি খুব ছোটো মনে করা ভুল হবে।

এমনকী আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসারীদের কিছু গবেষকগণও এই জটিল বিষয়ের কিছু প্রসঙ্গে উম্মাহকে আশাহত করেছেন এবং যথাযথ দিকনির্দেশনাও দিতে পারেননি। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের স্বীকৃত মত হলো, সাহাবিদের প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত ও সত্যনিষ্ঠ। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে তাঁরা পরস্পরে বাদ-বিবাদে লিপ্ত হলেও তাঁদের এই বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করা যাবে না। মনে করতে হবে, বিবদমান উভয় দলই নিজ নিজ ইজতিহাদের ভিত্তিতে সঠিক। তাঁদের ইজতিহাদের সঠিকতায় হয়তো সবাই সমান নয়। কারও ইজতিহাদ সঠিক, কারোটা হয়তো তারচেয়ে বেশি সঠিক। ভালো ও উত্তমের মাঝে ব্যবধানের মতো।

রাষ্ট্রপরিচালনায় ইসলামের মৌলিক দর্শন কী হবে—এ নিয়ে প্রচুর বির্তক হয়ে থাকে। কেউ খিলাফতকেই একমাত্র রাষ্ট্রদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রদর্শনকে অনৈসলামিক ও ভ্রান্ত দর্শন মনে করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, রাজতন্ত্রই হবে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম পছন্দ। দুঃখজনকভাবে এসব বিতর্ক মোটেই প্রান্তিকতামুক্ত নয়। এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের ভারসাম্যপূর্ণ আচরণই ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে। তারা মনে করেন, নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য কারণ সাপেক্ষে রাজতন্ত্র ইসলামে বৈধ। তবে ইসলাম খিলাফতকে প্রাধান্য দেয়।

সমগ্র মুসলিম জাতির ইতিহাসে মুসলিমদের পারস্পরিক বিবাদ ও বিভাজন একটি বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে রয়ে গেছে। এই বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মীমাংসার মাঝে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান শতধা বিভক্তি

ও জরাজীর্ণ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় নিহিত আছে। অথচ এর সমাধান কুরআনেই বর্ণিত আছে। মুসলিমদের পারস্পরিক বিবাদের সময় সংঘাতে শামিল না হয়ে সন্ধির পথ অবলম্বন করাই হলো কুরআনের আদর্শ। আর মুসলিমদের সংঘাত বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণও এটাই—প্রায় সবাই বিবাদিত মুসলিমদের একটি পক্ষকে গ্রহণ করে নিয়ে সংঘাতকে আরও প্রবলতর করে তোলে। সম্প্রীতি ও সন্ধির পথকে বন্ধুর ও অমসৃণ করে তোলে। অনেক সময় দেখা যায়, হক কথাকে প্রতিষ্ঠার নামেও 'হকপন্থি' মুসলিমরা পরস্পরে বিরোধ ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে 'হকপন্থিদের' মাঝেও জন্ম নিতে থাকে নতুন নতুন ফেরকা। তখন হককে বোঝা সাধারণ মুসলিমদের জন্য আরও দুরূহ হয়ে ওঠে। আমরা মনে করি, এই বইয়ের এ বিষয়ক আলোচনাটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিকতম।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের চিন্তাধারার প্রতিনিধি হিসেবে শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) সর্বজনমান্য। এসব বিষয়ে তাঁর আলোচনা অপেক্ষাকৃত বেশি তথ্যপূর্ণ ও দালিলিক। তাই মুশাজারাতে সাহাবি তথা সাহাবিদের বাদ-বিসংবাদ বিষয়ে কিংবা খিলাফত ও রাজতন্ত্র বিতর্কে গবেষকদের তাঁর গ্রন্থাদির দ্বারস্থ হতেই হয়। তবে বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে বই দুঃখজনকভাবে যৎসামান্য। বিষয়ের সঙ্গিনতা হয়তো একটি কারণ। আমরা এই সঙ্গিনতাকে উপেক্ষা করে সত্য ও ইনসাফের খাতিরে বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে তুলে দিচ্ছি।

বইটি শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর 'মাজমুউল ফতোয়া' নামক সুপ্রসিদ্ধ সংকলনে রয়েছে। তবে আমরা মূল পাঠ বা টেক্সট সংগ্রহ করেছি জর্দানের অভিজাত প্রকাশনী 'মাকতাবাতুল মানার' প্রকাশিত *আল খিলাফাতু ওয়াল মুলক* থেকে। অনুবাদ বইয়ের নাম নির্বাচনে মূল আরবি নামটির আক্ষরিক অনুবাদকে গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশেষে বইটির পাঠক ও বইয়ের প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা।

কামরুল হাসান নকীব
পূর্ববাড্ডা, ঢাকা

১১	মুখবন্ধ
১৫	শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) : জীবনবৃত্তান্ত
২৫	আনুগত্যের মূলনীতি
৪১	খিলাফত ও রাজতন্ত্র
৫৯	পূর্বেকার শরিয়ত ও আমাদের শরিয়তে রাজতন্ত্র
৬৪	সমাজে ইমাম বা শাসকদের অবস্থান
৭২	খিলাফতসংক্রান্ত কিছু ভ্রান্ত আকিদা
৮৬	সাহাবিদের পারস্পরিক যুদ্ধের ইতিহাস এবং আহলে সুন্নাহর অভিমত
৯৫	সাহাবিগণ সর্বোত্তম মানুষ এবং তাঁদের গালমন্দ করা গুনাহ
১২২	পারস্পরিক যুদ্ধ-সংঘাতের সময় সন্ধি ও তার পদ্ধতি
১৩৯	পাতানো ভ্রাতৃত্ব এবং আনসার-মুহাজিরদের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক

মুখবন্ধ

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন জনপদ মক্কা ছিল তাওহিদের উৎসভূমি। বহু পয়গম্বরের আদিপুরুষ ইবরাহিম (আ.) নিজ পুত্র ইসমাইল (আ.)-এর সহায়তায় সেখানে আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রথম গৃহ তথা কাবা ঘর নির্মাণ করেন। ইবরাহিম (আ.) কেনানে ফিরে গেলেও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.) সপরিবারে মক্কায় বসবাস করতে থাকেন। কালের আবর্তে সেই মক্কায় মূর্তিপূজা প্রবর্তিত হয়।

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন। এর আগেই তাওহিদের উৎসভূমি মক্কা শিরকের কেন্দ্রে পরিণত হয়, আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত কাবা ঘরে স্থাপিত হয় ৩৬০টি মূর্তি। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাবাসীকে শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে আল্লাহর একত্ববাদে ফিরে আসার আহ্বান জানান। ১৩ বছরের মাক্কিজীবনে কুরাইশ গোত্রের মুষ্টিমেয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশেষে হিজাজের আরেকটি জনপদ ইয়াসরিবের কিছু মানুষ হজ পালনের জন্য মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবি ﷺ-কে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাথিরা ইয়াসরিবে হিজরত করেন, জনপদটির নতুন নামকরণ হয় মদিনাতুর রাসূল বা মদিনা। মদিনার বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে বহু বছরের নির্যাতন, ভয় ও আতঙ্কের অবসানে নির্বিঘ্নে দ্বীন পালনের সুযোগ পায় মুসলিমরা।

মহানবি ﷺ-এর কার্যধারা পর্যালোচনায় বোঝা যায়, তিনি তাওহিদ ও ইবাদতের সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করেননি। তাই ইবাদত ও পার্থিব কর্মকাণ্ড পরিচালনায় তিনি দ্বৈত উৎস হতে প্রেরণা গ্রহণ করেননি। মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন সালাতের ইমাম, আবার তিনিই ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতি এবং বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর দেশ চালনায় সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁরা আনুষ্ঠানিক ইবাদত ও পার্থিব কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অভিন্ন উৎস হতে প্রেরণা গ্রহণের ধারা অব্যাহত রাখেন।

সেকালে পুরো দুনিয়ায় রাজতন্ত্র চালু থাকলেও তাঁরা রাজত্ব বা বাদশাহি কায়েম করেননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ জ্ঞানগরিমা, তাকওয়া-পরহেজগারি এবং সাহসিকতা ও বীরত্বের বিচারে খলিফা হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন, কিন্তু উমর (রা.) তাঁকে খলিফা হিসেবে নিয়োগ না করার নির্দেশ দেন।

কেবল শাসক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নয়, আর্থিক স্বচ্ছতা বিধান, জনগণের অধিকার আদায়, সুকৃতির লালন ও দুষ্কৃতির দমনসহ সকল ক্ষেত্রে প্রথম চার খলিফা (আবু বকর, উমর, উসমান ও আলি রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাই তাঁদের ৩০ বছরের শাসনকাল (১১-৪০ হিজরি) 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওওয়াহ' বা নবুয়তি ধারার খিলাফত নামে পরিচিত। প্রথম চার খলিফার শাসনব্যবস্থাকে খিলাফত নামকরণের দ্বিবিধ তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরই আদর্শে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, সেকালে সারা দুনিয়ায় প্রচলিত রাজতান্ত্রিকব্যবস্থা গ্রহণ না করে সত্যিকার অর্থে প্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। বলা বাহুল্য, খিলাফত মানে প্রতিনিধিত্ব।

তবে জনগণের নৈতিক মানে পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল তৃতীয় খলিফা উসমান (রা)-এর আমলেই। তাঁর শাসনকালের শেষার্ধে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী এমন ফিতনা শুরু করে যে, শান্তিপ্রিয় ও লাজনম্র খলিফা নিজের জীবন উৎসর্গ করেও তার অবসান ঘটাতে পারেননি। ফলে চরম গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে খলিফার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় রাসূল জামাতা আলি (রা.)-কে।

উসমান (রা.) হত্যার প্রতিক্রিয়ায় যে গোলযোগের সূচনা হয়, তার প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে আলি (রা.)-এর খিলাফতের পুরো সময়জুড়ে। এমনকী কয়েকটি যুদ্ধ করতেও বাধ্য হন আলি (রা.), যেগুলোর অধিকাংশই ছিল ভ্রাতৃঘাতী। জনৈক খারিজি আততায়ীর গুপ্ত হামলায় আলি (রা.) শহিদ হলে তাঁর চার বছরের শাসনের অবসান হয়। মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য! আলি (রা.)-এর মতো প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ খলিফা নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য উৎপাতহীন নিরুপদ্রব সময় পাননি।

আলি (রা.)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে নবুওয়তের আদর্শে পরিচালিত খিলাফতের অবসান ঘটে। মুসলিম দুনিয়ায় চালু হয় রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। নতুন ধারার শাসনব্যবস্থার ফলে কেবল শাসকের উত্তরাধিকার নির্ধারণ পদ্ধতিতেই পরিবর্তন আসে এমন নয়; বরং শাসনপ্রণালির বিভিন্ন ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত হয়। যদিও শাসনব্যবস্থার পরিচয়জ্ঞাপক শব্দ হিসেবে খিলাফত বহাল রাখা হয়, কিন্তু 'খিলাফাহ রাশিদা' হতে পৃথক করার জন্য বংশের দিকে সম্পর্কিত করে বলা হয় 'উমাইয়া খিলাফত', 'আব্বাসি খিলাফত' ইত্যাদি। এটিকে রাজতান্ত্রিক খিলাফতও বলা যায়।

উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের পর মুসলিম উম্মাহয় যে বিভাজনের ধারা সূচিত হয়, তার অবসান পরবর্তী সময়ে আর হয়নি। খিলাফত-প্রশ্নেও এই বিভাজনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রান্তিক ধারার কোনো কোনো গোষ্ঠী মনে করে—খিলাফত প্রতিষ্ঠা ওয়াজিব; কোনো অবস্থায় রাজতন্ত্র বৈধ নয়। আবার আরেক দল মনে করে—খিলাফত প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকলেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা বৈধ।

খিলাফত-প্রশ্নে প্রান্তিক ধারার গোষ্ঠীগুলোর ধারণা খণ্ডন করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের চিন্তাধারা তুলে ধরার লক্ষ্যেই শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এই গ্রন্থটি রচনা করেন। সেখানে তিনি মতামত দেন—স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠাই ওয়াজিব, তবে অপারগ অবস্থায় বা বিশেষ পরিস্থিতিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেটিও বৈধ বলে গণ্য হবে।

শাসনব্যবস্থার বৈধতার সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয় হলো—শাসকের আনুগত্য। কয়েকটি প্রান্তিক গোষ্ঠী নানা অজুহাতে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করে। এই মত খণ্ডন করার জন্য ইবনে তাইমিয়া (রহ.) হাদিসের আলোকে শাসকের আনুগত্যের বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, শাসকের বৈধ আদেশ মেনে চলতে হবে। এমনকী জুলুমের শিকার হলে বা অধিকারবঞ্চিত হলেও ধৈর্যধারণ করতে হবে। প্রাসঙ্গিক আরও কিছু বিষয়ও আলোচিত হয়েছে এই পুস্তকে। যেমন : বাগি (যারা বাড়াবাড়ি করে) ও খারেজিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি, মুসলিম গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির হুকুম এবং বিবদমান দলগুলোর মাঝে সন্ধি স্থাপনের উপায় ইত্যাদি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ইন্তেকালের পর প্রায় সাড়ে ছয়শত বছর অতিবাহিত হয়েছে। মুসলিম দুনিয়ার শাসনপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন খিলাফতের নামমাত্র অস্তিত্বও নেই। কিছু দেশে রাজতন্ত্রের প্রচলন রয়েছে। বহু দেশে চালু আছে গণতন্ত্র। এমন পরিস্থিতিতে শাসনপদ্ধতির বৈধতা-অবৈধতা নির্ধারণে এই গ্রন্থের ঢালাও প্রয়োগ কাম্য নয়। আলিমগণ অনিবার্য পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে রাজতন্ত্রের বৈধতা দিয়েছেন। তাঁদের অভিমতের অন্ধ ও আক্ষরিক প্রয়োগের পরিবর্তে তাঁদের বক্তব্যের চেতনাকে বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন : পূর্বসূরি আলিমগণের মতে, শাসকের আনুগত্য ওয়াজিব। এই অভিমতের পক্ষে হাদিসও উদ্ধৃত হয়েছে। এই অভিমতের ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিবাদের অধিকারকে আনুগত্য বর্জনের সমান্তরাল হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। গণতান্ত্রিক দেশে বাচনিক প্রতিবাদ, শোভাযাত্রা ও সমাবেশ আয়োজন করা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। পূর্বসূরি আলিমগণের অভিমতের অন্ধ ও আক্ষরিকভাবে প্রয়োগ করে এসব গণতান্ত্রিক অধিকারকে বিদ্রোহ বা আনুগত্যহীনতা বলে বিবেচনা করা যাবে না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর এই গ্রন্থ অধ্যয়নকালে এই বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখা উচিত।

পরিশেষে গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হওয়ায় গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি খিলাফতব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশী তরুণচিত্ত এই গ্রন্থ অধ্যয়নে সঠিক দিশা লাভ করবে।

অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক
আরবি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) : জীবনবৃত্তান্ত

জন্ম

পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল মনীষী জ্ঞানের জগতের পাশাপাশি রাজনৈতিক জগতেও বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়ে নিজের নামকে অবিস্মরণীয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে শাইখুল ইসলাম[১] ইবনে তাইমিয়া (রহ.) অন্যতম। এই মহান মনীষী জন্মগ্রহণ করেন আব্বাসি খিলাফত পতনের ঠিক চার বছর পর ৬৬১ হিজরি মোতাবেক ১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সময়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর জন্মস্থান বর্তমান তুরস্কের হাররান নামক স্থানে। তৎকালীন সময়ে তাঁর পরিবার ইলম ও জ্ঞানচর্চায় সমগ্র আরব জাহানে সুবিখ্যাত ছিল। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর বাবা আবদুল হালিম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)

---

১. উসমানি খিলাফতের সময় ধর্মীয় সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে 'শাইখুল ইসলাম' বলা হতো। ১৬ শতকের মধ্যভাগে এই পদটির ক্ষমতা অনেকগুণ বেড়ে যায়। শাসকগণ ধর্মীয় বিষয়াদির বাইরেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন। তবে উসমানি খিলাফতের পূর্বে আলিমগণ কুরআন ও হাদিসের অগাধ পাণ্ডিত্য এবং মুসলিম সমাজে ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে 'শাইখুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করতেন।

(৬২৭-৬৮২ হি.) ছিলেন অনেক বড়ো মুহাদ্দিস। দাদা মাজদুদ্দিন আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া (৫৯০-৬৫২ হি.) (রহ.)ও ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের অনেক বড়ো ফকিহ ও মুহাদ্দিস। হাম্বলি মাজহাবের শাস্ত্রীয় পরিভাষায় 'শাইখাইন' দ্বারা মাজদুদ্দিন ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও ইবনে কুদামা (রহ.) (৫৪১-৬২০ হি.)-কে বোঝানো হয়। তাঁর রচিত *আল মুহাররার* ও আল *মুনতাকা ফি আহাদিসিল আহকাম* গ্রন্থদ্বয় হাম্বলি মাজহাবের মূল্যবান আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।[২]

শৈশব ও ছাত্রজীবন

শাইখের বয়স যখন সাত বছর, তখন হাররানে মঙ্গলদের আক্রমণ হয়। ফলে তাঁর পরিবার সেখান থেকে হিজরত করে দামেস্কে চলে আসেন। ইতিহাসবিদগণ লিখেন, হিজরতের সময় এই বিদ্যোৎসাহী পরিবারটি তাঁদের মালামালের বোঝা ফেলে দিয়ে বংশপরম্পরায় সংরক্ষিত গ্রন্থাবলি সাথে নিয়ে সিরিয়ায় চলে আসেন।[৩]

দামেস্কে এসে তাঁর বাবা 'দারুল হাদিস আস সুকরিয়াহ' এবং উমাইয়া জামে মসজিদে পাঠদান শুরু করেন। শাইখের প্রাথমিক পড়াশোনা তাঁর বাবার কাছেই হয়। খুব অল্প বয়সেই তিনি কুরআন হেফজ করেন। পরে বাবার তত্ত্বাবধানে থেকেই হাম্বলি ফিকহের মৌলিক পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি সিরিয়ার দুই শতাধিক মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদিস শ্রবণ করেন।[৪]

তাঁর বাবা ও দাদার মতো তিনিও প্রখর স্মৃতিশক্তি ও তুখোড় মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। ছোটোবেলায় এক বড়ো আলিম তাঁর স্মৃতিশক্তির জনশ্রুতি শুনে তাঁকে পরখ করতে চাইলেন। এজন্য তিনি শিশু ইবনে তাইমিয়াকে স্লেটে ১৩টি হাদিস লিখতে বললেন এবং পরক্ষণেই আবার মুছে ফেলতে বললেন। তারপর বললেন হাদিসগুলো শোনাতে। তিনি সকল হাদিস নির্ভুলভাবে শুনিয়ে দিলেন। অনুরূপভাবে তিনি হাদিসের সনদ দিয়েও

---

[২]. ইমাম শাওকানি (রহ.) (১১৭৩–১২৫৫ হি.)-এর জগদ্‌বিখ্যাত *নাইনুল আওতার* কিতাবটি মূলত এই গ্রন্থটিরই ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

[৩]. *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস*, ২/৩৮

[৪]. *আল কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা-২

তাঁকে পরখ করলেন। অতঃপর তাঁর প্রখর মেধাশক্তি দেখে সেই বড়ো আলিম যারপরনাই বিস্মিত হলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন।[৫]

শিক্ষকতা

১৭ বছর বয়স থেকে ইবনে তাইমিয়া (রহ.) শিক্ষকতা ও ফতোয়া প্রদান করা শুরু করেন। তবে বাবার ইন্তেকালের পর ২২ বছর বয়সে যেই দিন তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন, সেই দিনটি ছিল তাঁর শিক্ষকতাজীবনের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। ২২ বছরের এক যুবকের দারস শুনতে সেদিন সিরিয়ার বিদ্বানমণ্ডলীর ভিড় জমেছিল। কাজিউল কুজাত বাহাউদ্দিন আশ-শাফেয়ি স্বয়ং হাজির ছিলেন সেখানে। এ ছাড়াও শাইখুশ-শাফিইয়্যাহ তাজুদ্দিন ফাজারিসহ হাম্বলি মাজহাবের অনেক ইমামও সেই দারসে উপস্থিত ছিলেন। সেই দিনটি সম্পর্কে ইবনে কাসির (রহ.) (৭০১-৭৭৪ হি.) বলেন—

> 'এটা ছিল বিস্ময়কর এক দারস। এর ব্যাপক উপকারিতা এবং সাধারণ জনগণের নিকট পছন্দনীয় হওয়ার দরুন শাইখ তাজুদ্দিন ফাজারি পুরো দারসটিই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী এত তরুণ বয়সে এমন মূল্যবান দারসের জন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।'[৬]

এ ছাড়াও মাদরাসায়ে হাম্বলিয়াসহ সিরিয়া ও মিশরের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠগুলোতে তিনি দারস প্রদান করেন। তাঁর ছাত্রের সংখ্যা ছিল অগণিত।

রাজনৈতিক জীবন

৬৯৯ হিজরিতে সিরিয়ায় যখন ইরান ও ইরাকের তাতারি শাসক কাজান[৭] আক্রমণ করে বসে, তখন তাদের মোকাবিলা করার জন্য মিশরের

---

[৫]. *ইবনে তাইমিয়া*, ইমাম আবু জাহরা, পৃষ্ঠা-২১

[৬]. *আল বিদাআ ওয়ান নিহায়া* (১৩/ ৩০৩)

[৭]. কাজান ছিলেন চেঙ্গিজ খানের প্রপৌত্র। ৬৯৪ হিজরিতে আমির তুজুন (রহ.)-এর দাওয়াতি তৎপরতায় ইসলাম কবুল করলেও পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার চারিত্রিক পরির্বতন সূচিত হয়নি। তার মুসলিম নাম ছিল মাহমুদ।

সুলতান মুহাম্মাদ ইবনে কালায়ান সসৈন্যে রওয়ানা হন। দামেস্কের বাইরে উভয়পক্ষের তুমুল লড়াই। মুসলিমরা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও পরাজয় বরণ করে। দামেস্কে শহরবাসী আতঙ্কিত ও ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ে এবং এই দুর্ধর্ষ তাতারিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারে, এই পরিস্থিতে সন্ধি ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। কিন্তু সন্ধির পথও এত মসৃণ নয়। তাই সন্ধির বার্তা নিয়ে যাওয়ার জন্য শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শাইখুল ইসলাম (রহ.)-কে মনোনীত করেন।

শাইখের সাথে কাজানের এই সাক্ষাৎ ইতিহাসে অনন্য হয়ে আছে। শাইখ তাকে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি আহ্বান করেন এবং কঠোর ভাষায় তার কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন। কাজান শাইখের কথায় খুবই প্রভাবিত হন এবং অনেক যুদ্ধবন্দিকে মুক্ত করে দেন। বলা বাহুল্য, তাতার জাতি এত সহজে দমার পাত্র ছিল না। ৭০০ হিজরিতে তারা আবার দামেস্ক আক্রমণ করে। ফলে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর জীবনে শুরু হয় কলম-কিতাবের কোমল জীবনে তরবারির তীক্ষ্ণ ও তেজস্বী অধ্যায়।

সংগ্রাম ও যুদ্ধের জীবন

তাতারিদের পুনর্বার আক্রমণের কথা শুনে সমগ্র দামেশকবাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মিশরের সুলতান তাদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েও হঠাৎ পিছু হটে গেলেন। জাতির এহেন দুর্দিনে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতো মহামানব কিছুতেই নির্বিকারভাবে বসে থাকতে পারেন না; ছুটে যান শহরের গভর্নরের কাছে। তাকে বলেন—

> ‘আমরা মজলুম; আর মজলুমের জয় সুনিশ্চিত। কেননা, আল্লাহ বলেছেন—
>
> ذٰلِكَ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ-
>
> “যে ব্যক্তি নিজের প্রতি হওয়া অবিচারের সমপরিমাণ বদলা নেয়, সে পুনরায় জুলুমের শিকার হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।”' সূরা হাজ্জ : ৬০

সিরিয়ার আলিম ও নেতাগণ শাইখের কথায় আশ্বস্ত হন। তাঁরা সবাই শাইখের কাছে অনুরোধ করেন মিশরে গিয়ে সুলতানকে বোঝানোর জন্য। তিনি দীর্ঘ আট দিন মিশরে অবস্থান করে সুলতানকে সাহস জোগান। একপর্যায়ে শাইখের কথায় প্রভাবিত হয়ে সুলতান যুদ্ধে শরিক হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) জনগণ থেকে শুরু করে শাসক, সেনাবাহিনী—সবাইকে একক প্রচেষ্টায় জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। বহু আলিম ও বেসামরিক জনগণ এই জিহাদে শামিল হন। সবাইকে তিনি সাহস দিয়ে বলতেন—

> 'জয় আমাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ!'

সে সময় শাইখুল ইসলাম সৈনিকদের দেখিয়ে দেখিয়ে রমজানের রোজা ভাঙতেন আর রাসূল ﷺ-এর হাদিস শুনিয়ে বলতেন—

> 'নবি করিম ﷺ বলেন—"তোমরা আগামীকাল শত্রুর মোকাবিলা করবে, তাই রোজা ভাঙলে বেশি শক্তি পাবে।"'

তাতারিদের বিরুদ্ধে জিহাদের মুহূর্তে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর পর্বতসম অবিচলতা ও সাগরসম সাহসিকতা ইতিহাসের পাতাকে চিরকাল আলোকিত করে রাখবে। অবশেষে ৭০২ হিজরির ৪ রমজান সত্যি সত্যিই মুসলিমরা তাতারিদের শোচনীয়ভাবে পরাভূত করে। তাতারিদের বহু নেতা প্রাণ হারায় এবং অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। দীর্ঘদিন যাবৎ সুলতান, আলিম-উলামা ও জনসাধারণকে যে জয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী শাইখুল ইসলাম দিয়ে আসছিলেন, তা সত্যে রূপান্তরিত হলো। ইতিহাস তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষাৎ প্রমাণ পেল। দামেস্কবাসী শাইখুল ইসলামকে বিপুল আড়ম্বরতার সাথে স্বাগত জানায় এবং তাঁর জন্য দুআ করে।

কারাজীবন

শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) সত্যের প্রতি নিরন্তর আপসহীন ছিলেন। সমাজে পরিব্যাপ্ত বিদআত ও কুসংস্কার নির্মূলে নিরলস সংগ্রামের জন্য তিনি বহুবার কারারুদ্ধ হন। কখনো আলিম-উলামার রোষানলে পড়ে, কখনো-বা কাজির হিংসার শিকার হয়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। এমনকী শাসকের বিরাগভাজন হয়েও তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে।

কারাগারের সেই দুর্বিষহ দিনগুলোতে শাইখ কখনো এক মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হননি। এই বিষয়ে তাঁর শিষ্য ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) লিখেন—

> 'কারাগারে একবার শাইখুল ইসলাম আমাকে বলেন—"শত্রুরা আমাকে কিছুই করতে পারবে না। আমার সুখ ও জান্নাত তো সর্বদা আমার সাথেই থাকে। ইলম আমার সুখ, আর ঈমান হলো আমার জান্নাত। আমি যেখানেই যাই না কেন, তারা আমার সাথেই থাকে; কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। কারাগার হলো আমার জন্য নিছক নির্জনবাস। এখন আমার মৃত্যু হবে শাহাদাত। আর দেশান্তর তো আমার জন্য কেবল প্রমোদভ্রমণ।"'[৮]

দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও সমাজ সংস্কারে ইবনে তাইমিয়া (রহ.)

দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও ইলমুল কালামের প্রতি ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর আকর্ষণ তৈরি হয় মূলত কয়েকটি কারণে। শাইখুল ইসলামের সময়টা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের উত্তাল এক সময়। মুসলিমদের ভেতর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে অধঃপতনের জোরালো সূচনা শুরু হয় মূলত এই সময় থেকেই। তাসাওউফের নামে সে সময়ে প্রচুর কুসংস্কার দার্শনিক আবহে মুসলিম সমাজে ব্যাপক প্রভাবশালী ছিল। তাই মুসলিম সমাজে বিরাজমান কুসংস্কার ও বিদআতের মূলোৎপাটন করা ছিল সময়ের ঐকান্তিক দাবি। কিন্তু এই বিদআতগুলোর শিকড় এতটাই গভীরে ছিল যে, এর জন্য দরকার ছিল বিশেষ প্রস্তুতি এবং দর্শন ও ইলমুল কালাম সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) তাঁর পূর্বেকার ও সমকালীন হাম্বলি আলিমদের মধ্যে এই বিষয়ে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও শূন্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

এর পাশাপাশি আরেকটি কারণও উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হলো—হাম্বলি মাজহাবের প্রমাণ প্রক্রিয়া ছিল প্রধানত সরল ও কুরআন-হাদিসের বাহ্যিক বোধকেন্দ্রিক। পক্ষান্তরে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আশয়ারিদের

---

৮. পৃষ্ঠা ৫৭, *আল ওয়াবিলুস সায়্যিব*, ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)

প্রমাণ পদ্ধতিতে ছিল প্রচুর বৈচিত্র্য ও গভীরতা। ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের প্রাচুর্য। তাই তিনি দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার গভীর পাঠে আত্মনিয়োগ করেন। একপর্যায়ে তিনি তৎকালীন সমাজে দর্শনের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদ ও কুসংস্কারের শিকড় স্পর্শ করতে সক্ষম হন। শাইখুল ইসলাম যথাসম্ভব ভারসাম্যপূর্ণ ভাষায় এসবের প্রতিবাদ ও যুক্তি খণ্ডন করেন।

গবেষকরা বলেন—দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও ইলমুল কালামের বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানচর্চায় তিনি এতটাই ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যে, স্বয়ং সেই শাস্ত্রেরই দুর্বলতা ও ত্রুটি উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। সেইসঙ্গে এই শাস্ত্রের বিভিন্ন পণ্ডিত, গবেষক, এমনকী গ্রিক দার্শনিকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে এমন কিছু প্রশ্ন ও সমালোচনা উত্থাপন করেছিলেন, যার সদুত্তর এখন পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি।[১] তবে কিছু গবেষকের অনুমান হলো—ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও তাঁর অনুসারীদের সমালোচনার যে অংশটি জনপ্রিয় হওয়ার কথা ছিল, তার বদলে এমন কিছু সমালোচনা মুখরোচক হয়েছে, যার ফলে মুসলিম সমাজে এই শাস্ত্রগুলোর যথাযথ চর্চা আর হতে দেখা যায়নি। একপর্যায়ে এই শাস্ত্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ইউরোপিয়ানদের হাতে। ফলত পৃথিবীর শাসনভার কুক্ষিগত করতে পরবর্তী সময়ে এসব শাস্ত্রের চর্চা তাদের অনেক সহযোগিতা করেছে।

তবে এতটুকু সকলেই স্বীকার করেন যে, শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) দর্শন, ইলমুল কালাম, তাসাউফ ইত্যাকার শাস্ত্রের প্রভূত সংস্কার সাধন করেছেন। পাশাপাশি মুসলিম সমাজে চলমান যাবতীয় শিরক, বিদআত ও পথভ্রষ্ট মতাদর্শের বিরুদ্ধে আমরণ লড়াই করে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে একদল যুবক তৈরি হয়েছিল, যারা এসব কুসংস্কার নির্মূলে সদা বদ্ধপরিকর থাকত। শাইখের কথায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়ত। একবার তিনি শুনতে পেলেন, এক এলাকায় কতিপয় মুসলিম পাথরের পূজা করা শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সদলবলে সেখানে গিয়ে পাথরটি ভেঙে ফেলেন।

---

[১]. আবুল হাসান আলি নদবি (রহ.), *সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস* (২/৪৩)

মৃত্যু

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ৭২৮ হিজরিতে দামেস্কের কেল্লায় বন্দি অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মাকবারায়ে সুফিয়্যাতে তাঁকে দাফন করা হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর উদারতা ও মহানুভবতার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখই এখানে যথেষ্ট মনে করি। ইবনে কাসির (রহ.) লিখেন—

> 'মিশরে ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর সবচেয়ে বড়ো প্রতিপক্ষ মালেকি মাজহাবের কাজি ইবনে মাখলুফ বলতেন, "আমি তাঁর মতো উদার মনের মানুষ আর দেখিনি। আমরা সুলতানকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি (যদিও তাতে সফল হইনি), কিন্তু তিনি যখন সুযোগ পেলেন, আমাদের সবাইকে মাফ করে দিলেন। অধিকন্তু তিনি আমাদের হয়ে সুলতানের কাছে সুপারিশ করলেন (পরে সুলতান তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া থেকে বিরত রইলেন)।"' [১০]

ছাত্রবৃন্দ

শাইখুল ইসলাম (রহ.) যদি কেবল দারসের ময়দানেই নিরত থাকতেন, তবুও তিনি সমকালীন সকল মনীষী থেকে নির্দ্বিধায় এগিয়ে যেতেন। তিনি এমন কিছু শিষ্য-শাগরেদ তৈরি করেছেন, পরবর্তী সময়ে যাদের কোনো সমকক্ষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আমরা এখানে তাঁর কয়েকজন ছাত্রের কথা বলে নেওয়া জরুরি মনে করছি।

---

[১০]. *আল বিদাআ ওয়ান নিহায়া (১৪/৫৪)*

ইমাম শামসুদ্দিন জাহাবি (রহ.) (৬৭৩-৭৪৮ হি.)

ইসলামের ইতিহাসে এমন মনীষী খুবই কম পাওয়া যায়, যারা একই সঙ্গে ইতিহাস, উলুমে হাদিস ও রিজালশাস্ত্রে এমন সব যুগান্তকারী কিতাব লিখে গেছেন, যা শাস্ত্রগুলোর সমান সময় মুসলিমদের মাঝে জীবিত থাকবে বলে নিঃসংকোচে অনুমান করা যায়। এসব শাস্ত্রে মোটামুটি তাঁদের কথাই চূড়ান্ত বক্তব্য। জাহাবি (রহ.) তেমনই একজন মনীষী। হাফিজুদ্দুনিয়া শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) (৭৭৩-৮৫২ হি.)-এর মতো পণ্ডিতপ্রবর ইমাম জমজমের পানি পান করার সময় দুআ করেছিলেন—'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ইমাম জাহাবি (রহ.)-এর মতো পাণ্ডিত্য দান করুন।'

ইমাম জাহাবি (রহ.) ফিকহের ক্ষেত্রে শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি তাঁর প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলোতে এমন বহু কিতাবের তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন—যা আজ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তাই মুসলিম উম্মাহ আজও সেসব অবলুপ্ত কিতাবের অমূল্য জ্ঞান-সম্পদ থেকে উপকৃত হচ্ছে। তাঁর এই সকল বিরল জ্ঞানকর্মের জন্য মুসলিমরা অনেক বড়ো অপূরণীয় ক্ষতি থেকে বেঁচে গেছে। তাঁর রচিত প্রায় চার শতাধিক কিতাব রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. *তারিখুল ইসলাম*, ৫২ খণ্ডে প্রকাশিত। ৪০ হাজার মনীষীর জীবনী এবং তাঁদের সময়ের ইতিহাস এখানে সংকলিত হয়েছে।

২. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত

৩. *মিজানুল ইতিদাল*, ৪ খণ্ডে প্রকাশিত

৪. *তাজকিরাতুল হুফফাজ*, ৪ খণ্ডে প্রকাশিত

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.)

হাম্বলি মাজহাবের অনেক বড়ো একজন ইমাম। ফিকহ, হাদিস, তাফসির, সিরাত, আত্মশুদ্ধি ও সাহিত্যসহ বহু শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্য সকল মতাদর্শের মুসলিমের কাছে তিনি অনুসরণীয়। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর ফিকহি মতামত সমর্থনের জন্য তাঁকেও ওস্তাদের সাথে ৭২৬ হিজরিতে কারাবরণ করতে হয়। তাঁর বিখ্যাত রচনাবলির মধ্যে রয়েছে—

১. *জাদুল মাআদ*
২. *মাদারিজুস সালিকিন*
৩. *আলামুল মুআক্কিইন*

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) (৭০১-৭৭৪ হি.)

শাফেয়ি মাজহাবের বড়ো মাপের একজন ইমাম। তাফসির, উলুমে হাদিস ও ইতিহাসশাস্ত্রে তাঁর অপার পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর রচিত জগদ্‌বিখ্যাত গ্রন্থগুলো শাস্ত্রীয় আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি—

১. *আল বিদআ ওয়ান নিহায়া*, ১৫ খণ্ডে প্রকাশিত
২. *তাফসিরে ইবনে কাসির* , ৯ খণ্ডে প্রকাশিত
৩. *জামিউস সুনানি ওয়াল মাসানিদ*, ১০ খণ্ডে প্রকাশিত

এ ছাড়া হাফিজুদ্দুনিয়া ইমাম মিজ্জি (রহ.) (৬৫৪-৭৪২ হি.) ও ইমাম ইবনে মুফলিহ (রহ.) (৭০৮-৭৬৩ হি.)-এর মতো অসংখ্য যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর দারসের বরকত লাভ করেছেন। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ কিতাবে শাইখের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

রচনাবলি

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শতাধিক।[১১] তার মধ্য হতে সমধিক বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর তালিকা পেশ করছি—

১. *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ৩৭ খণ্ডে প্রকাশিত
২. *ইকতিজাউস সিরাতিল মুসতাকিম*
৩. *রাফউল মালাম আন আইম্মাতিল আলাম*
৪. *আল ফুরকান বাইনাল হাক্কি ওয়াল বাতিল*
৫. *আত-তাওয়াসসুল ওয়াল ওয়াসিলাহ*
৬. *আল আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ*
৭. *আল জাওয়াবুস সাহিহ লিমান বাদ্দালা দিনাল মাসিহ* ইত্যাদি।

---

[১১]. *আল উলামাউল উজ্জাব*, আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, পৃষ্ঠা-৯৯

আনুগত্যের মূলনীতি

আল্লাহ, রাসূল ও শাসকের আনুগত্য ওয়াজিব

আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের সংক্ষিপ্ত মূলনীতি হলো—'আল্লাহর আনুগত্য ও শাসকের আনুগত্য করা এবং শাসকের কল্যাণ কামনা করা ওয়াজিব।' তাই যেসব বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ আনুগত্য ও সহযোগিতার আদেশ দিয়েছেন, সেসব বিষয়ে আনুগত্য করা এবং (তাদের শাসনকার্যে) সহযোগিতা করা প্রতিটি মানুষের জন্য অন্যান্য ওয়াজিবের মতোই সদা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যার যা প্রাপ্য (আমানত), তা পরিশোধ করার আদেশ দিচ্ছেন এবং যখন তোমরা লোকেদের মাঝে বিচারকার্য করবে, তখন ন্যায়ভিত্তিক বিচার করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কতই-না সুন্দর উপদেশ দেন! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।' সূরা নিসা : ৫৮

আল্লাহ আরও বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا-

'হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার শাসকদের অনুসরণ করো। আর তোমাদের মাঝে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য হলে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে সোপর্দ করে দাও; যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস করো। এটাই কল্যাণকর ও উত্তম সমাধান।' সূরা নিসা : ৫৯

সুতরাং আল্লাহ মুমিনদের আদেশ দিয়েছেন—আল্লাহর, রাসূলের ও শাসকদের আনুগত্য করতে। পাশাপাশি হকদারের হক আদায় করার এবং পারস্পরিক বিচারকার্যে ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করার। একই সঙ্গে পারস্পরিক বিবদমান বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে সোপর্দ করারও আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ ও রাসূলের কাছে সোপর্দ করার পদ্ধতি

আলিমগণ বলেন—আল্লাহর কাছে সোপর্দ করার অর্থ : আল্লাহর কিতাবের দ্বারস্থ হওয়া। আর রাসূলের মৃত্যুর পর তাঁর কাছে সোপর্দ করার অর্থ হচ্ছে, রাসূলের সুন্নাহর দ্বারস্থ হওয়া। আল্লাহ বলেন—

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۫ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ ۪ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

'মানবকুল এক গোত্রভুক্ত ছিল। তারপর আমি তাদের মাঝে নবিদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।

আর তাঁদের সাথে সত্যসহ কিতাব দিয়েছি মানুষের মাঝে মতভেদপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা করার জন্য। অথচ কিতাবপ্রাপ্তরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও পারস্পরিক বিদ্বেষবশত মতভেদে লিপ্ত হয়। অতঃপর আল্লাহ অনুগ্রহ করে বিশ্বাসীদের তাদের মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সত্য পথের দিশা দেন। আল্লাহ যাকে খুশি সঠিক পথের দিশা দেন।' সূরা বাকারা : ২১৩

আল্লাহ তাঁর নাজিলকৃত কিতাবকেই মানুষের মতভেদপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসাকারী বানিয়েছেন।

সহিহ মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি ﷺ রাতের নামাজে বলতেন—

'হে জিবরাইল, মিকাইল ও ইসরাফিলের প্রতিপালক! হে আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা! হে দৃষ্টাদৃষ্টের জ্ঞানী! তোমার বান্দাদের মাঝে মতভেদপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা করো। আমাকে তোমার অনুগ্রহে সত্য পথের দিশা দাও। নিশ্চয় যাকে খুশি তুমি সঠিক পথের দিশা দাও।'[১২]

সহিহ মুসলিমে তামিম দারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

'হিতচর্চাই (কল্যাণ কামনা) দ্বীন, হিতচর্চাই দ্বীন, হিতচর্চাই দ্বীন।' সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন—'কার হিতচর্চা হে আল্লাহর রাসূল!' রাসূল ﷺ বললেন—'আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসকদের এবং জনগণের হিতচর্চা।'[১৩]

সহিহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন—

'তোমাদের জন্য তিনটি কাজকে প্রশংসনীয় করা হয়েছে। এক. আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা।

---

[১২]. মুসলিম : ১৮৪৭, নাসায়ি : ১৬২৪, আবু দাউদ : ৭৬৭, ইবনে হিব্বান : ২৬০০

[১৩]. মুসলিম : ৫৫, আবু দাউদ : ৪৯৪৪, নাসায়ি : ৪১৯৭ । সাধারণত 'নাসিহা' শব্দের তরজমা করা হয় 'কল্যাণ কামনা' । কিন্তু 'আল্লাহর কল্যাণ কামনা' বিষয়টি অশোভনীয় ও অসৌজন্যমূলক। তাই আমরা তরজমা করেছি 'হিতচর্চা'।

দুই. আল্লাহর রশিকে সবাই একত্রে ধারণ করা এবং বিভক্ত না হওয়া। তিন. আল্লাহ যাদেরকে তোমাদের শাসক বানিয়েছেন, তাদের হিতচর্চা করা।'[১৪]

আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইবনে মাসউদ ও জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) থেকে, যেখানে রাসূল ﷺ বলেন—

> 'যে আমাদের নিকট থেকে হাদিস শুনে তাদের নিকট পৌঁছে দেয়, যারা হাদিস শোনেনি; আল্লাহ তাকে সমৃদ্ধশালী করুন। অনেক লোক আছে—যারা নিজের থেকে অধিক জ্ঞানী ফকিহের নিকট ফিকহ পৌঁছে দেয়। ফিকহের অনেক বহনকারী আছে, যে ফকিহ নয়। তিনটি বিষয় যেন কোনো মুসলিমের মনকে ধোঁকায় না ফেলে—ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত, শাসকদের হিতচর্চা বা কল্যাণ কামনা এবং মুসলিমদের দলের সাথে থাকা। কারণ, তাদের দুআ পেছন থেকে তাদের ঘিরে থাকে।'[১৫]

এখানে বর্ণিত তিনটি বিষয় এবং পূর্বের হাদিসে বর্ণিত তিনটি বিষয় অভিন্ন। পূর্বের হাদিসে এসেছে—

১. আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা।

২. আল্লাহর রশিকে সবাই একত্রে ধারণ করা এবং বিভক্ত না হওয়া।

৩. আল্লাহ যাদের শাসক বানিয়েছেন, তাদের কল্যাণ কামনা বা হিতচর্চা করা।

সুতরাং আল্লাহ যখন এ তিনটি বিষয়কে পছন্দ করেন, তখন আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তুকে পছন্দ করাই যার আরাধ্য, তার অন্তর এ বিষয়গুলো সম্পর্কে ধোঁকা, অপছন্দ ও বিরাগের শিকার হবে না; বরং মুমিনের অন্তর তাকে আনন্দচিত্তে গ্রহণ করবে।

---

[১৪]. মুসলিম : ১৭১৫

[১৫]. তিরমিজি : ২৬৫৬, আবু দাউদ : ৩৬৬০, নাসায়ি, সুনানে কুবরা : ৫৮৪৭, ইবনে মাজাহ : ৪১০৫

'আনসারদের কেউ রাসূল ﷺ-এর সাথে একাকী দেখা করে বলল—"আপনি কি আমাকে কাজে নিযুক্ত করবেন না, যেমনটা অমুককে করেছেন?" জবাবে রাসূল ﷺ বললেন—"নিশ্চয়ই তোমরা আমার পরে স্বজনপ্রীতি দেখতে পাবে। অতএব, হাউজে কাওসারে আমার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ধরো।"'[১৯]

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে সহিহাইনে আরও এসেছে, রাসূল ﷺ বলেন—

'নিশ্চয়ই আমার পরে স্বজনপ্রীতি ও এমন কিছু বিষয় পাবে—যা তোমাদের কাছে গর্হিত মনে হবে।' সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ভেতর কেউ সে যুগ পেলে আপনি তাঁকে কী আদেশ দেবেন?' রাসূল ﷺ বললেন—'তোমাদের ওপর অন্যের যে হক আছে, তা আদায় করো। আর অন্যের কাছে তোমাদের যে হক আছে, তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করো।'[২০]

সহিহ মুসলিমে ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে—

'সালামা জুফি (রা.) রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন—"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের শাসক যদি এমন হয়—যে আমাদের কাছে তার হক ঠিকই চায়, কিন্তু আমাদের হক দিতে অসম্মতি জানায়, তাহলে আপনার নির্দেশ কী?" রাসূল ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবি আবার জিজ্ঞেস করল, রাসূল মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর দ্বিতীয়বার অথবা তৃতীয়বারও জিজ্ঞেস করল। আশআস ইবনে কাইস (রা.) তাঁকে একপাশে এনে বললেন—"তখনও শাসকের কথা শুনতে হবে এবং মানতে হবে। কারণ, তারা যা করবে, তার বোঝা তাদের টানতে হবে। আর তোমরা যা করবে, তার বোঝা তোমাদের বহন করতে হবে।"'[২১]

---

[১৯]. বুখারি : ৩৭৯৩, মুসলিম : ১০৫৯

[২০]. বুখারি : ৭০৫২, মুসলিম : ১৮৪৩

[২১]. মুসলিম : ১৮৪৬

মোটকথা, শাসক স্বজনপ্রীতি করলেও আল্লাহ ও রাসূল ﷺ শাসকদের আনুগত্যকে মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব করেছেন। আর যা কিছু আল্লাহ ও রাসূল হারাম করেছেন—তা হারাম; যদিও কাউকে তা করতে বাধ্য করা হয়। অর্থাৎ হারাম কাজ বা আল্লাহর নাফরমানি করতে শাসক আদেশ দিলে তা মানা যাবে না, তা হারামই থাকবে।

প্রতিশ্রুতি বহির্ভূত হলেও ভালো কাজে শাসকের আনুগত্য ওয়াজিব

(জনগণ শপথ নিক আর না নিক, সর্বাবস্থায় শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব।)

আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর আদেশ অনুযায়ী, শাসক জনগণের নিকট থেকে আনুগত্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি বা বাইয়াত গ্রহণ করুক আর না করুক, শাসকের আনুগত্য করা জনগণের জন্য ওয়াজিব; যেমনিভাবে বাইয়াত গ্রহণ না করলেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ ইত্যাদি ইবাদত বান্দার ওপর ওয়াজিব।

আর যদি শাসক জনগণের নিকট থেকে আনুগত্য ও সহযোগিতার শপথ নেন, তাহলে ধরে নেওয়া হবে, তিনি এই সংক্রান্ত আল্লাহ ও রাসূলের আদেশকে অধিক গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছেন এবং তার ওপর অবিচল থেকেছেন; চাই সেই শপথ আল্লাহর নামে হোক কিংবা মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত অন্য কোনো পন্থায় হোক। কেননা, শাসকের আনুগত্য ও সহযোগিতা করা শপথ ব্যতীত এমনিতেই ওয়াজিব। উপরন্তু যদি শপথ নেওয়া হয়, তাহলে তা বলা বাহুল্য। তাই আল্লাহ ও রাসূল ﷺ শাসকদের সাথে প্রতারণা, বাগাওয়াত বা অবাধ্যাচরণের যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন (বা হারাম বলেছেন), তা শপথ না নিলেও বলবৎ থাকবে।

যেমন : ধরুন কেউ শপথ করল—সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজানের রোজা রাখবে, অন্যের হক আদায় করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে, অথচ এগুলো শপথ ছাড়াই তার ওপর ওয়াজিব ছিল। এখন শপথের মাধ্যমে সে এটাকে নিজের ওপর পূর্বাপেক্ষা বেশি আবশ্যক করে নিল। তেমনিভাবে শিরক করা, মিথ্যা বলা, মদ পান করা, জুলুম করা, অশালীন কর্ম করা, শাসকের সাথে প্রতারণা করা এবং শাসকের অনুসরণীয় বিষয়ে তাকে না মানা ইত্যাদি বিষয়গুলো এমনিতেই হারাম। 'এসব কাজ কখনো করব না'

—এমন শপথ ছাড়াই এগুলো হারাম। এখন যদি কেউ এসব কাজ না করার শপথ করেই ফেলে, তাহলে তো বলাই বাহুল্য।

শাসকের আনুগত্য, কল্যাণ কামনা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, আমানত আদায় করা, ইনসাফ করা ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ যে আদেশ দিয়েছেন, তা যদি কসমকারী ব্যক্তি পালন না করে, তবে তার ওপর কসম ভঙ্গের ফতোয়া প্রযোজ্য হবে না (বরং ওয়াজিব ভঙ্গের ফতোয়া প্রযোজ্য হবে)। সে কসমের খেলাফ করেছে—এমন ফতোয়া দেওয়াও যাবে না এবং এ বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞেস করাও যাবে না। আর যে মুফতি তাকে কসম ভঙ্গ করেছে মর্মে ফতোয়া দেবে এবং কসম ভঙ্গ করেছে বলবে, সে মূলত আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপ করবে এবং অনৈসলামি পন্থায় ফতোয়া দেবে। কারণ ব্যাবসা, বিয়ে, ভাড়া ইত্যাদি বিষয়ে চুক্তি কসম খাওয়া ছাড়াই অবশ্য পালনীয়।

জোরপূর্বক অনৈতিকভাবে কারও নিকট থেকে শপথ নেওয়া

জমহুর আলিমগণ বলেন—'জোরপূর্বক কারও নিকট থেকে কসম নেওয়া হলে কসম সংঘটিত হবে না; চাই সে কসম আল্লাহর নামে হোক কিংবা তালাক, দাসমুক্তি বা মান্নতের কসম হোক।' এটা ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মত। কিন্তু যদি শাসক জনগণকে তার আনুগত্য ও সহযোগিতার জন্য বাধ্য করে এবং তাদের থেকে কসম নেয়, তাহলে তাতে আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ অমান্য হবে না। এই কসম ভাঙাও যাবে না। কারণ, যে বিধান কসম ছাড়াই ওয়াজিব, তাকে কসম তো কেবল মজবুতই করতে পারে; দুর্বল করতে পারে না। যদি তাকে অপারগ ধরে নিই, তবুও না।

আর শাসক প্রায়শই জনগণের নিকট থেকে শপথ বা প্রতিশ্রুতি নিয়ে থাকে বলে যারা দাবি তোলেন—সর্বাবস্থায় নির্দিষ্ট কিছু কসমের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পূরণ করা অবশ্য পালনীয়, তাদের বলব—জোরপূর্বক কসম করানোর ক্ষেত্রে তোমাদের মতামতটি তোমাদেরই বিপক্ষে যায়। কেননা, তোমাদের বক্তব্য হলো—জোরপূর্বক যে কসম করানো হয়, তা পালন করা বা পূরণ করা আবশ্যক নয়; যদিও সে কসমটি শাসক গ্রহণ করে। এ ছাড়াও 'হিলাবিষয়ক' বহু মাসয়ালায় আল্লাহ, রাসূল ﷺ ও শাসকের অবাধ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই জোরপূর্বক কসমের পক্ষে ফতোয়া দেওয়া হয়।

তবে এটা সত্য যে, ইলম ও আমলওয়ালা পরহেজগার আলিমগণ কখনোই আল্লাহর আদেশকে উপেক্ষা করে শাসকের বিরুদ্ধে অবাধ্যতা, প্রতারণা ও বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করেন না। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস তার সাক্ষী।

শাসকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা এবং শরয়ি চুক্তি ভঙ্গ করা হারাম

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

> 'কিয়ামতের দিন প্রত্যেক গাদ্দারের পেছনে তার গাদ্দারি অনুযায়ী পতাকা স্থাপন করা হবে।'[২২]

সবচেয়ে বড়ো গাদ্দারি হলো শাসকের সাথে গাদ্দারি করা। মদিনার একটি গোত্র যখন শাসকের সাথে বিদ্রোহ ও গাদ্দারি করে বসল, তখন এই হাদিসটি ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন। সহিহ মুসলিমে নাফি (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

> 'ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সময়ে যখন গোলযোগ চলছিল, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে মুতি (রা.)-এর কাছে এলেন। ইবনে মুতি (রা.) বললেন—"আবু আবদুর রহমানকে (ইবনে উমর রা.) বসার গদি এগিয়ে দাও।" ইবনে উমর (রা.) বললেন—"আমি বসতে আসিনি; আমি এসেছি তোমাকে একটি হাদিস শোনাতে। রাসূল ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি—যে লোক শাসকের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, কিয়ামতের দিন সে সাক্ষী-সাবুতহীন হয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। আর যে লোক বাইয়াতের বন্ধনহীন হয়ে মারা গেল, সে জাহেলি মৃত্যুবরণ করল।"'[২৩]

সহিহাইনে এসেছে, ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন—

> 'কারও যদি শাসকের কোনো অপছন্দনীয় কাজ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তার ধৈর্য ধরা উচিত। কেননা, কেউ যদি শাসকের

---

[২২]. বুখারি : ৬১৭৯, মুসলিম : ১৭৩৫

[২৩]. মুসলিম : ১৮৫১

সাথে বিদ্রোহ করার অল্প কিছুক্ষণ পরেই মারা যায়, তাহলেও সে জাহেলি মৃত্যুর শিকার হবে।'[২৪]

সহিহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

'যে লোক শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল এবং সমাজবিচ্ছিন্ন বা জামাত থেকে বিভক্ত হয়ে মারা গেল, সে জাহেলি মৃত্যুবরণ করল। আর যে লোক অস্বচ্ছ পতাকাতলে আসাবিয়্যাত বা প্রান্তিকতার বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করে কিংবা প্রান্তিকতার প্রতি আহ্বান করে অথবা প্রান্তিকতার মদদ জোগাতে মৃত্যুবরণ করে, সে জাহেলি মৃত্যুবরণ করল।'[২৫]

'যে আমার উম্মতের ওপর চড়াও হয়ে ভালো ও মন্দ লোকদের হামলা করে; এমনকী মুমিনদেরও ছাড় দেয় না এবং জিম্মিদের হক নষ্ট করে, সে আমার উম্মত নয়। তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার সাথেও তার কোনো সম্পর্ক নেই।'[২৬]

উপরিউক্ত হাদিসে নবিজি তিন ধরনের লোকদের কথা বলেছেন। প্রথম ব্যক্তি, যে শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে এবং দলবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের বদলে ক্ষমতার লোভ ও প্রান্তিকতার বশবর্তী হয়ে হত্যাকর্মে লিপ্ত হয় প্রবৃত্তিপূজারিদের মতো তথা বাতিলপন্থিদের মতো। যেমন : কায়েস ও ইয়ামন গোত্রের লোকেরা।

তৃতীয় ব্যক্তি, যারা মুসলিম জিম্মিদের মাল ডাকাতি করে নেয় এবং যাদের বিরুদ্ধে আলি (রা.) জিহাদ করেছেন, সেই খারেজিদের হারুরি গোষ্ঠীর লোকেরা। রাসূল ﷺ তাদের সম্পর্কে বলেছেন—

'তোমাদের মধ্যে এমন লোক হবে, যারা তোমাদের সাথে নামাজ-রোজা আদায় করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করাকে অপমানজনক মনে করবে। কুরআন তাদের গলা দিয়ে নামবে না। তির যেভাবে ধনুক থেকে বের হয়, ইসলাম থেকে তারা

---

[২৪]. বুখারি : ৭১৪৩, মুসলিম : ৪৮৯৬

[২৫]. মুসলিম : ১৮৫০

[২৬]. মুসলিম : ১৮৪৮

সেভাবে বের হয়ে যাবে। তোমরা তাদের যেখানেই পাবে, হত্যা করবে। কারণ, তাদের যে হত্যা করবে, তাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন প্রতিদান দেবেন।'[২৭]

শাসক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস হলেও আনুগত্য আবশ্যক

শাসক কালো নিগ্রো দাস হলেও রাসূল ﷺ তার আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন। বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে—

> 'যদি তোমাদের ওপর এমন শাসক নিয়োগ দেওয়া হয়—যে কালো কুৎসিত এবং মাথায় ঘা আছে, তবুও তার কথা শোনো এবং মানো।'[২৮]

আবু জর গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'আমার বন্ধু আমাকে অসিয়ত করেছে যে, তোমাদের শাসক হাত-পাহীন কালো হাবশি দাস হলেও তার কথা শোনো এবং মানো।'

বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে—

> 'যদিও সেই শাসক এমন কালো নিগ্রো দাস হয়, যার মাথাকে ঘায়ের মতো মনে হয়।'[২৯]

সহিহ মুসলিমে উম্মুল হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমি রাসূল ﷺ-কে বিদায় হজের সময় বলতে শুনেছি—

> "যদি কোনো ক্রীতদাস তোমাদের কিতাবুল্লাহ মোতাবেক শাসন করে, তোমরা তার কথা শোনো এবং মানো। (আরেক বর্ণনায় এসেছে কালো হাত-পাহীন ক্রীতদাস)।"'[৩০]

---

[২৭]. বুখারি : ৩৬১১, মুসলিম : ১০৬৬

[২৮]. বুখারি : ৭১৪২

[২৯]. মুসলিম : ১৮৩৭, বুখারি : ৭১৪২

[৩০]. মুসলিম : ১৮৩৮

সৎ ও অসৎ শাসক কারা, কখন তাদের মানা যাবে না

আওফ ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন—

> ‘তারাই সর্বোত্তম শাসক, যারা জনগণকে ভালোবাসে এবং জনগণও যাদের ভালোবাসে। যারা জনগণের জন্য দুআ করে এবং জনগণও যাদের জন্য দুআ করে। আর নিকৃষ্ট শাসক তারাই, যারা জনগণকে ভালোবাসে না এবং জনগণও তাদের ভালোবাসে না। যারা জনগণকে বদদুআ করে এবং জনগণও তাদের জন্য বদদুআ করে। আমরা (সাহাবিরা) বললাম— “আমরা কি তখন তাদের সাথে তলোয়ারের মাধ্যমে ফয়সালা করব?” নবিজি বললেন—“না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত না। জেনে রেখ! শাসক নিযুক্ত হওয়ার পর যদি কেউ শাসকের কোনো পাপ কাজ দেখতে পায়, তাহলে সেই পাপ কাজকে শুধু অপছন্দ করবে; কিছুতেই সে শাসকের আনুগত্য থেকে বের হতে পারবে না।”’[৩১]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেন—

> ‘নিশ্চয়ই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ কিয়ামতের দিন নুরের মিম্বরে আল্লাহর ডানে অবস্থান করবেন। আর আল্লাহর উভয় দিকই ডান। ন্যায়পরায়ণ তাঁরাই, যারা বিচারকাজে ইনসাফ করে; পরিবারের সাথে ইনসাফ করে; সর্বোপরি তাঁর ওপর ন্যস্ত যাবতীয় বিষয়ে ইনসাফ করে।’[৩২]

সহিহ মুসলিমে আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন—

> ‘হে আল্লাহ! যে আমার উম্মতের শাসনভার গ্রহণ করার পর তাদের সাথে কঠোরতা করে, তুমি তার সাথে কঠোরতা করো। আর যে আমার উম্মতের ওপর কোমল আচরণ করবে, তুমি তার সাথে কোমল আচরণ করো।’[৩৩]

---

[৩১]. মুসলিম : ১৮৫৫

[৩২]. মুসলিম : ১৮২৭

[৩৩]. মুসলিম : ১৮২৮

সহিহাইনে হাসান বসরি (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন—

> ‘মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর অসুখের সময় আবদুল্লাহ[৩৪] ইবনে জিয়াদ (রা.) তাঁকে দেখতে যান। পরে এই রোগে মাকিল (রা.) মারা গিয়েছিলেন। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা.) আবদুল্লাহকে বললেন—“তোমাকে একটি হাদিস শোনাব, যা আমি রাসূল ﷺ থেকে শুনেছি। নবিজি বলেন—‘কোনো বান্দাকে জনগণের শাসনভার দেওয়ার পর সে যদি জনগণের ওপর জুলুমরত অবস্থায় মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।’”’[৩৫]

সহিহ মুসলিমে আরেকটি হাদিস এসেছে—

> ‘কেউ যদি শাসক হওয়ার পর জনগণের কল্যাণ ও হিতচর্চার জন্য কোনো শ্রম না দেয়, তাহলে সে জনগণের সাথে জান্নাতে যেতে পারবে না।’[৩৬]

ভালো কাজে শাসকের আনুগত্য করতে হবে

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন—

> ‘জেনে রাখো! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই অধীনস্থের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল; পরিবার সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন মহিলা তার স্বামীর ঘরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল; এ বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন দাস তার মুনিবের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল; তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব, জেনে রাখো! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের দায়িত্বাধীন ও আওতাধীন বিষয় সম্পর্কে তোমরা সকলেই জিজ্ঞাসিত হবে।’[৩৭]

---

[৩৪]. ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ‘আবদুল্লাহ’ লিখেছেন। বুখারি ও মুসলিমে ‘উবাইদুল্লাহ’ এসেছে।

[৩৫]. বুখারি : ৭১৫০

[৩৬]. মুসলিম : ১৪২

[৩৭]. বুখারি : ৭১৩৮, মুসলিম : ১৮২৯

আলি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> 'রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সেনাবাহিনী পাঠালেন এবং এক ব্যক্তিকে তার আমির নিযুক্ত করে দিলেন। আমির একটি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করলেন এবং অধীনস্থদের তাতে ঝাঁপ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। একদল লোক তাতে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুতি নিল। কিন্তু অপর একদল বলল—"আমরা (ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তো) আগুন থেকেই পালিয়ে এসেছি। সুতরাং আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।" যথাসময়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে সে ব্যাপারটি উত্থাপিত হলো। যারা আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হয়েছিল, তাদের লক্ষ করে নবিজি ﷺ বললেন—"যদি তোমরা আগুনে প্রবেশ করতে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করতে।" অপর দলকে লক্ষ করে তিনি ভালো কথা বললেন। তিনি বললেন—"আল্লাহর অবাধ্যতা হয় এমন কাজে আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলই ভালো কাজে।"'[৩৮]

আনুগত্য আল্লাহর জন্য; দুনিয়ার জন্য নয়

মহান আল্লাহ বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ-

> 'আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।' সূরা জারিয়াত : ৫৬

তিনি আরও বলেন—

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ-

> 'আমি সকল রাসূলকে পাঠিয়েছি কেবল আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করার জন্য।' সূরা নিসা : ৬৪

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ-

> 'যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করে।' সূরা নিসা : ৮০

---

৩৮. বুখারি : ৭২৫৭, মুসলিম : ১৮৪০

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

'আপনার রবের কসম! তারা কখনোই মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবদমান বিষয়ে আপনাকে বিচারক মানবে এবং আপনার ফয়সালার বিষয়ে তাদের মনে কোনো প্রকার সংকোচ থাকবে এবং হৃষ্টচিত্তে তা মেনে না নেবে।' সূরা নিসা : ৬৫

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ-

'হে নবি! আপনি বলুন—"যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে ভালোবাসো। তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন। তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন।"'
সূরা আলে ইমরান : ৩১

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا- وَ قَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا- رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا-

'যেদিন তাদের চেহারাকে জাহান্নামের আগুনে নাড়াচাড়া করা হবে, তারা বলবে—"হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম! রাসূলের আনুগত্য করতাম!" তারা বলবে—"হে আমাদের রব! আমরা তো আমাদের নেতা ও গুরুজনদের আনুগত্য করেছি। ফলত তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। হে আমাদের রব! তুমি তাদের আজাবকে দ্বিগুণ করে দাও এবং তাদের ওপর মহা অভিশাপ দাও।"' সূরা আহজাব : ৬৬-৬৮

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا-

> 'যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা কিয়ামতের দিন নবি, সত্যনিষ্ঠ, শহিদ, সৎকর্মপরায়ণ ও নিয়ামতপ্রাপ্ত মানুষদের সাথে থাকবে। আর তাঁরা কতই-না উত্তম বন্ধু!' সূরা নিসা : ৬৯

অতএব, আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করা প্রত্যেকের ওপর ওয়াজিব। আল্লাহ শাসকদের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন। তাই তাদের আনুগত্য করাও ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর হাতে। যে লোক সম্পদ ও ক্ষমতার লোভে শাসকদের আনুগত্য করবে—তথা শাসক সম্পদ ও ক্ষমতা প্রদান করলে আনুগত্য করবে, অন্যথায় করবে না, তাহলে তার জন্য আখিরাতে কোনো কল্যাণ নেই।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'তিন রকম লোকের সঙ্গে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'
>
> এক. ওই ব্যক্তি, যে অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত পানির মালিক হওয়া সত্ত্বেও নির্জন জায়গায় আগন্তুক মুসাফিরকে পানি পান করতে দেয় না।
>
> দুই. ওই ব্যক্তি, যে আসরের পর অন্য লোকের নিকট দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করতে গিয়ে এমন কসম খায়—"আল্লাহর শপথ! এটার এত দাম হয়েছে।" ক্রেতা সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে পণ্যটি কিনে নেয়, অথচ সে জিনিসের এত দাম নয়।
>
> তিন. ওই ব্যক্তি, যে একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে ইমামের বাইয়াত গ্রহণ করে। শাসক তার মনের বাসনা পূর্ণ করলে সে বাইয়াত পূর্ণ করে। আর যদি তা না হয়, তাহলে বাইয়াত ভঙ্গ করে।'

খিলাফত ও রাজতন্ত্র

নবুয়তি খিলাফতের সময়সীমা এবং রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

রাসূল ﷺ বলেন—

> 'নবুয়তি খিলাফত ৩০ বছর থাকবে। তারপর আল্লাহ যাকে খুশি রাজত্ব দেবেন অথবা তাঁর রাজত্ব দেবেন।'

আবু দাউদের বর্ণনার শব্দগুলো আবদুল ওয়ারিস ও আওয়ামের সূত্রে এভাবে এসেছে—

> 'খিলাফত ৩০ বছর অব্যাহত থাকবে। তারপর রাজতন্ত্র কায়েম হবে। খিলাফত ৩০ বছর অব্যাহত থাকবে। তারপর খিলাফত রাজতন্ত্রে পরিণত হবে।'

এই বর্ণনাটি হাম্মাদ ইবনে সালামাহ আবদুল ওয়ারিস ইবনে সাইদ থেকে এবং আওয়াম ইবনে হাওশাব প্রমুখ সাইদ ইবনে জুমহান থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিস। তিনি রাসূল ﷺ-এর দাসী সাফিনা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ প্রমুখ সুনান রচয়িতাদের অনেকেই এটা বর্ণনা করেছেন।[৩৯]

---

৩৯. আবু দাউদ : ৪৬৪৭

বাতিলপন্থি ছাড়া সবাই আলি (রা.)-কে শেষ খলিফা মানেন

ইমাম আহমদ (রহ.)সহ প্রমুখ ইমামগণ মনে করেন, আলি (রা.) চতুর্থ ও শেষ খলিফা ছিলেন। এটাই খুলাফায়ে রাশেদিন তথা সত্যনিষ্ঠ খলিফাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ও প্রমাণিত সত্য। ইমাম আহমদ (রহ.) এটাকে প্রমাণিতও করেছেন। অতঃপর এ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যারা আলি (রা.)-এর শেষ খলিফা হওয়ার বিষয়ে চুপ থাকবে কিংবা তাঁকে শেষ খলিফা মনে করবে না, তারা মূলত গাধাতুল্য। তাদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে না। এটাই ফকিহ, সুন্নাহবিশারদ ও সুফিতাত্ত্বিকদের সর্বসম্মত মতামত। বলা ভালো, এটা সর্বসাধারণেরও অভিমত।

প্রকৃত অর্থে এ বিষয়ে তারাই দ্বিমত করেন, যারা প্রবৃত্তিপূজারি বা বাতিলপন্থি। এদের মধ্যে কতিপয় কালামশাস্ত্রবিদও আছেন। যেমন : রাফিজি সম্প্রদায়; যারা অবশিষ্ট তিন খলিফার খিলাফতের কুৎসা করে অথবা খারেজি সম্প্রদায়; যারা রাসূল ﷺ-এর দুই জামাতা আলি ও উসমান (রা.)-এর খিলাফতের বিরূপ সমালোচনা করে কিংবা নাসিবি সম্প্রদায়; যারা আলি (রা.)-এর খিলাফতকে অস্বীকার করে। কিছু মূর্খ লোকও এই দলের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকাল এবং আমুল জামাত

হিজরি একাদশ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন। এর ঠিক ৩০ বছর পর হিজরি ৪১ সনের জুমাদাল উলা মাসে হাসান ইবনে আলি (রা.) মুসলিমদের দুই সম্প্রদায়ের মাঝে সন্ধির জন্য শাসনভার থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তখন সকল মুসলিম মুয়াবিয়া (রা.)-এর পতাকাতলে একত্রিত হয়। তাই একে আমুল জামাত বা দলবদ্ধতার বছর বলা হয়। এজন্য মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন রাজতন্ত্রের প্রথম পুরুষ।

নবুয়তি খিলাফতের পর কী হবে

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে—

> 'নবুয়তি খিলাফতের সাথে রহমত থাকবে। তারপর রাজা; তার সাথেও রহমত থাকবে। তারপর আসবে স্বেচ্ছাচারী রাজা। তারপর আসবে নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজা।'[৪০]

একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আমার পরে তোমাদের মধ্যকার জীবিতরা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহ আঁকড়ে থেকো। খুব মজবুতভাবে তা ধারণ করো। নবোদ্ভূত বিষয় বা বিদআত থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, প্রতিটা বিদআতই গোমরাহি।'[৪১]

রাজাদের খলিফা বলা যাবে কি

খুলাফায়ে রাশেদিন তথা প্রথম চার খলিফা ছাড়া অন্যদেরও খলিফা বলা যাবে; যদিও-বা তারা রাজা হন এবং যদিও অন্যান্য নবির কোনো খলিফা ছিল না। কারণ, সহিহাইনে একটি হাদিস আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'বনি ইসরাইলকে শাসন করতেন নবিগণ। যখনই কোনো নবি ইন্তেকাল করতেন, তখনই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন আরেকজন নবি। আর আমার পরে কোনো নবি নেই, তবে খলিফা থাকবে অনেক। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "তখন আমাদের করণীয় কী?" প্রথম যে খলিফা বাইয়াত নেবেন, তাঁকেই তোমরা মানবে। তাঁর মৃত্যুর পরে যে প্রথমে বাইয়াত নেবে,

---

[৪০]. মুজামুল আওসাত : ৬/৩৪৫, মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৫/১৯৩, হাদিসটি মুসলিম শরিফে পাওয়া যায়নি। তবে হাদিসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু ইয়ালা (রহ.) ও ইমাম বাজ্জার (রহ.) তাঁদের কিতাবে এই হাদিসটি এনেছেন। ইমাম হাইসামি (রহ.) হাদিসটি তাঁর কিতাব 'মাজমাউজ-জাওয়াই'দে এনে বলেন, এই হাদিসের রাবিগণ সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য—অনুবাদক

[৪১]. আবু দাউদ : ৪৬০৭, তিরমিজি : ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ : ৪২, আহমাদ : ১৭১৪২

তাঁকে মানবে এবং তাঁদের হক আদায় করবে। কেননা, তাঁদেরকে জনগণের হক সম্পর্কে আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন।'[৪২]

'খলিফা থাকবে অনেক' কথাটি দ্বারা বোঝা যায়—চার খলিফা ছাড়াও আরও খলিফা হবে। কেননা, চারজন তো অনেক নয়। তা ছাড়া 'প্রথম খলিফাকেই মানবে' কথাটি দ্বারা বোঝা যায়—খলিফাদের মধ্যে মতভেদ হবে। অথচ চার খলিফার মাঝে কোনো মতভেদ হয়নি। আর 'তাঁদের হক আদায় করবে। কেননা, তাঁদেরকে আল্লাহ্ জনগণের হক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন'—এটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, শাসকদের হক আদায় করতে হবে গনিমতের মাল ও সম্পদ ইত্যাদি থেকে—যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকিদাকে মজবুত করে।

জনগণের দায়িত্ব কী

আমি অন্যত্রে বলেছি—দেশের দুর্দশার জন্য কেবল শাসক, তাদের প্রতিনিধি, বিচারক ও আমলাদের দুর্বলতা বা ক্রটিই দায়ী নয়; বরং শাসক-জনগণ উভয় পক্ষের দুর্বলতা ও ক্রটিই এর জন্য দায়ী।
কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন—

'তোমরা যেমন, তেমন শাসকই তোমাদের ওপর নিযুক্ত হবে।'[৪৩]

আল্লাহ বলেন—

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

'এভাবেই আমি কতিপয় জালিমের ওপরে কতিপয় জালিমকে শাসক নিযুক্ত করি।' সূরা আনআম : ১২৯

শাসকদের ভালো কাজে আনুগত্য করা

আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি, যেসব কাজে আল্লাহর অবাধ্যতা নেই, সেসব কাজে শাসকের আনুগত্য ও সহযোগিতা করা, তাদের বিচার ও বণ্টনে ধৈর্য ধরা এবং তাদের সাথে যুদ্ধে ও নামাজে শরিক হওয়া ভালো

---

[৪২]. মুসলিম : ১৮৪২, বুখারি, ৩৪৫৫

[৪৩]. *আল মাকাসিদুল হাসানাহ* : ৩৮৫, *কানজুল উম্মাল* : ৬/৮৯; ফিরদাউস, দাইলামি : ৩/৩০৫

কাজের অন্তর্ভুক্ত। একই সঙ্গে তাদের তদারকি ছাড়া সংঘটিত হয় না এমন কাজে আনুগত্য করাও জরুরি। এসব কাজের মধ্য দিয়ে তো প্রকৃত অর্থে কুরআনে বর্ণিত 'ভালো ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো' বলতে যা বোঝানো হয়েছে, তা-ই করা হচ্ছে। আর যেসব কাজে তাদের আনুগত্য করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেসবে তাদের আনুগত্য করা মানেই হচ্ছে—অন্যায় ও অবিচারের কাজে সহযোগিতা করা। যেমন : শাসকদের মিথ্যাকে সত্য মনে করা, জুলুমে সহযোগিতা করা, সর্বোপরি আল্লাহর নাফরমানিতে তাদের সাহায্য করা ইত্যাদি।

নবুয়তি খিলাফত সমাপ্তির দ্বারা রাসূল ﷺ যা বুঝিয়েছেন

নবুয়তি খিলাফতের পর ইমারত গ্রহণ-বর্জন নিয়ে ভালো ও মন্দের যে বিবাদ দেখা দেয়, তা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। কারণ, ৩০ বছর পর খিলাফত সমাপ্তির যে বক্তব্য, তাতে রাজতন্ত্রের নিন্দা ও দূষণীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষত আবু বাকরা (রা.)-এর হাদিসটিতে। এ হাদিসটিতে আবু বাকরা (রা.)-এর স্বপ্নকে রাসূল ﷺ অপছন্দ করেন এবং বলেন— 'নবুয়তি খিলাফতের পর হবে রাজতন্ত্র। আল্লাহ যাকে খুশি রাজত্ব দান করেন।'

ইমাম ও শাসক নির্ণয় এবং সৎকর্মপরায়ণ শাসকের উত্তম পরিণামের কথা যেসব আয়াত ও হাদিসে বলা হয়েছে, সেসব আয়াত ও হাদিসে নবুয়তি খিলাফতের পরে শাসক নির্ণয়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং প্রশংসাও করা হয়েছে। তাই এখন আমাদের উচিত হলো—কখন খলিফা নির্ণয় দূষণীয় ও প্রশংসনীয়, তা খোলাসা করা। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'আল্লাহ আমাকে দুটি জিনিসের মধ্যে একটি নির্বাচনের অধিকার দিয়েছেন। আমি আল্লাহর "রাজা রাসূল" হব, নাকি "দাস রাসূল" হব। আমি "দাস রাসূল" হওয়াকে গ্রহণ করেছি।'[৪৪]

---

[৪৪]. আহমদ : ৭১৬০, বাজ্জার : ৯৮০৭

নবুয়তি খিলাফত কি ওয়াজিব

ইমারত বা শাসন, কাজা ও শাসক—এই তিন বিষয় রাষ্ট্রশাসনে বা রাষ্ট্র পরিচালনায় হাজির থাকা যদি মূল বিষয় হয়, তাহলে রাজতন্ত্র কি জায়েজ? আর খিলাফত কি মুস্তাহাব? নাকি পর্যাপ্ত বিদ্যা ও সামর্থ্যের অভাব ব্যতীত তা জায়েজ নেই? এক্ষেত্রে আমরা বলব, মূলত রাজতন্ত্র জায়েজ নয়। খিলাফত প্রতিষ্ঠা করাটাই ওয়াজিব। আমরা পূর্বে একটি হাদিস উল্লেখ করেছি। সেখানে 'আমার পরে তোমাদের মধ্যকার জীবিতরা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে'—এই কথাটি বলার পর সেই পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী হবে, সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে—'তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহ আঁকড়ে থাকো। খুব মজবুতভাবে তা ধারণ করো। নবোদ্ভূত বিষয় বা বিদআত থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, প্রতিটা বিদআতই গোমরাহি।'

সুতরাং এটা খলিফাদের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার একটি নির্দেশ এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান। পাশাপাশি এটা খলিফাদের সুন্নাহ (খিলাফত) পরিপন্থি নবোদ্ভূত (রাজতন্ত্র) বিদআত সম্পর্কে একটি সতর্কবার্তা। তাই এই হাদিসে বর্ণিত খলিফাদের সুন্নাহর অনুসরণের আদেশ এবং বিদআত বর্জনের নির্দেশের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে খিলাফত ওয়াজিব।

উপরন্তু রাসূল ﷺ অন্য একটি হাদিসের মাধ্যমে আরেকটু নির্দিষ্ট করে বলেছেন—

> 'আমার পর তোমরা আবু বকর ও উমর—এই দুজনের অনুসরণ করবে।'[৪৫]

তাই তাঁরাও তাঁদের দুজনকে অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। আর খুলাফায়ে রাশেদিন তাঁদের চারজনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার কথা বলেছেন।

এখানে আবু বকর ও উমর (রা.)-কে নির্দিষ্টকরণটা দুইভাবে হয়েছে।

এক. সুন্নাহ হলো, যে আমল তাঁরা দুজন সকলের জন্য ধার্য করেছেন। আর কুদওয়া হলো, তাঁরা কোনো আমলকে সুন্নাহ হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও তাঁদের দুজনকে অনুসরণ করতে হবে।

---

[৪৫]. তিরমিজি : ৩৬৬২, ইবনে মাজাহ : ৯৭, আহমদ : ২৩২৯৩

দুই. সুন্নাহকে রাসূল ﷺ খলিফাদের সাথে সম্বন্ধিত করেছেন; সব সাহাবির সাথে করেননি। তাই কেউ কেউ বলেন—সুন্নাহ হলো যে আমলের ব্যাপারে সাহাবিগণ একমত হয়েছেন; কতিপয় সাহাবির বিচ্ছিন্ন মতকে সুন্নাহ বলা যাবে না। আর কুদওয়া হওয়াটা এই দুজনের সাথে খাস বা এই দুজনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তবে এতে আপত্তির অবকাশ আছে।

এর থেকে বোঝা যায়, আলি ও উসমান (রা.) যে ইজতিহাদগুলো করেছিলেন, তারচেয়ে ভালো ইজতিহাদ আবু বকর ও উমর (রা.) করেছিলেন। নসুস ও জমহুরের মতৈক্য এই দুজনের সিদ্ধান্তের যথাযোগ্যতাকে সমর্থন করে। আর এর কারণ হলো—আলি ও উসমান (রা.)-এর সময় উম্মতের মাঝে সৃষ্ট বিভাজন। তাই তাঁদের অজুহাত দিয়ে উম্মাহর মাঝে বিভাজন তৈরির করার উদ্দেশ্যে তাঁদের অনুসরণ করা যাবে না। কারণ, বিভাজন খলিফাদের সুন্নাহ না।

তাই তো আমরা দেখতে পাই, আবু বকর ও উমর (রা.) উম্মতকে শাসন করেছেন উদ্দীপনা ও ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে।[৪৬] রক্তপাত ও সম্পদের বিষয়ে তাঁদের কোনো ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়নি। উসমান (রা.)-এর মূলমন্ত্র ছিল উম্মতকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে শাসন করা। তাই মালের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সম্পদ বণ্টনের বিষয়ে তাঁকে ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে।[৪৭] আর আলি (রা.) শাসনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ

---

৪৬. অর্থাৎ তারা মুসলিম জনসাধারণকে উৎসাহমূলক কর্মপন্থার পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।—অনুবাদক

৪৭. শাইখুল ইসলাম (রহ.) এখানে উসমান (রা.)-এর স্বভাবসুলভ উদারতা ও নম্রতার কথা বলেছেন। উসমান (রা.) কখনো বাইতুলমাল থেকে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজের সম্পদ থেকে উদার হস্তে জনসাধারণ ও তাঁর আত্মীয়দের দান করতেন। (*মাওসুআতুত তারিখিল ইসলামি, মাহমুদ শাকের*, ৩/২৩৪) তবে তিনি নিজে বাইতুলমাল থেকে কোনো ভাতা গ্রহণ করতেন না। (*আল মাবসূত*, শামসুল আইম্মাহ শারাখসি রহ., ৩/২১)

তাবাকাতে ইবনে সাদে বর্ণিত আছে, উসমান (রা.) একবার 'মজলিশে শূরা'র সদস্যদের সামনে বলেন—'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আত্মীয়দের দান করতেন। অধিকন্তু আমি দরিদ্র ও সম্বলহীন আত্মীয়দের নিয়ে বাস করি। তাই তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। তোমরা যদি একে ভুল মনে করো, তাহলে তারা এ অনুদান ফিরিয়ে দেবে।' (*আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ইবনে সাদ ৩/১৯০)

করেছিলেন ভীতিপ্রদর্শনকে। তাই তাঁকে রক্তপাত করার বিষয়ে বিশেষ ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। উক্ত পর্যালোচনাকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি, সম্পদ বণ্টন ও উম্মতকে শাসন করা—এই উভয় ক্ষেত্রেই আবু বকর ও উমর (রা.)-এর খোদাভীতি চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । উসমান (রা.)-এর খোদাভীতি পূর্ণতা পেয়েছে ক্ষমতার ক্ষেত্রে। আলি (রা.)-এর খোদাভীতি পূর্ণতা পেয়েছে অর্থ-সম্পদ বণ্টনের বেলায়।

সর্বোপরি রাসূল ﷺ-এর খিলাফতপরবর্তী রাজতন্ত্রকে অপছন্দ করাটাই প্রমাণ করে, এতে দিনের ওয়াজিবকে আংশিক পরিত্যাগ করা হয়েছে।

উসমান (রা.)-এর সম্পদ বণ্টন বিষয়ে কিছু ঐতিহাসিক ও বাতিলপন্থি লোকেরা অভিযোগ আরোপ করে বলে—উসমান (রা.) তাঁর আত্মীয়দের অগ্রাধিকার দিতেন। তাদের প্রচুর অর্থ-সম্পদ দান করতেন। তিনি কুরাইশদের চার ব্যক্তিকে চার লাখ দিনার দিয়েছিলেন। মারওয়ানকে হাজার হাজার দিনার দান করেছিলেন। এর জবাবে ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন—'এ বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা নেই। হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই তাঁর আত্মীয়দের দান করতেন। পাশাপাশি তাঁর আত্মীয় নয়, এমন ব্যক্তিদেরও তিনি দান করতেন। সত্য কথা হলো—তিনি সকল মুসলিমকেই দান করতেন। কিন্তু সমালোচকরা যে নির্দিষ্ট বিশাল অঙ্ক দানের কথা বলে, তার কোনো দলিল ও প্রমাণ নেই। এটা নিরেট মিথ্যাচার। শুধু উসমান (রা.) কেন, খুলাফায়ে রাশেদিনের কেউ-ই উল্লিখিত অঙ্কের কাছাকাছি পরিমাণ অনুদান কাউকে দেননি। (*মিনহাজুস সুন্নাহ*, ইবনে তাইমিয়া, ৬/২৪৯,২৫০)

মোটকথা, উসমান (রা.) মূলত আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সম্পদ বাইতুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না রেখে জনসাধারণের মাঝে বণ্টন করতেন। উমর (রা.) সম্পর্কে ইমাম ইবনুল জাওজি (রহ.) বলেন—তিনি বছরে একবার রাষ্ট্রীয় কোষাগার ঝাড়ু দেওয়ার আদেশ দিতেন। অর্থাৎ কোষাগার খালি করার নির্দেশ দিতেন। (*মানাকিবু উমর উবনুল খাত্তাব*, ইবনুল জাওজি, ৭৯) উসমান (রা.)-এর সময়ে বিভিন্ন ভূখণ্ড বিজিত হওয়ার দরুন বাইতুলমালে প্রচুর সম্পদ জমা হতে থাকে। তাই এই মাল বণ্টন করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। সর্বোপরি এটা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহও বটে। (দ্রষ্টব্য, সূরা হাশর : ৭)

রাজতন্ত্রের হুকুম

যারা রাজতন্ত্রকে বৈধ বলেন, তাদের দলিল হলো—রাসূল ﷺ মুয়াবিয়া (রা.)-কে বলেন—

> 'তুমি যদি কোনো রাষ্ট্রের মালিক বা রাজা হও, তাহলে উত্তমরূপে শাসন করো।'[৪৮]

তাদের অন্য আরেকটি দলিল হলো—

> 'একবার মুয়াবিয়া (রা.) রাজার পোশাকে শামে এলেন। উমর (রা.) তাঁকে দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মুয়াবিয়া (রা.) রাজকীয় শান-শওকত ও চাকচিক্য গ্রহণ করার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করলেন। সব শুনে উমর (রা.) বললেন—"আমি তোমাকে এসব করতে নিষেধ করি না, আদেশও দিই না।"'

এক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেন—উমর (রা.) যেহেতু মুয়াবিয়া (রা.)-কে নিষেধও করেননি আবার আদেশও দেননি, তাই এর দ্বারা বোঝা যায়—মুয়াবিয়া (রা.) যে কারণ দর্শিয়েছেন, সেটা তাঁর মনঃপূত হয়নি। তাই এটা একটা নিছক ইজতিহাদ হিসেবে বিবেচ্য।

এক্ষেত্রে মধ্যমপন্থি মতামত হলো—খিলাফত ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনমাফিক খিলাফত থেকে বের হওয়া যাবে অথবা এভাবে বলা যায়—শাসনের মূল উদ্দেশ্যটি যদি রাজতন্ত্রের মাধ্যমে হাসিল করা সহজ হয়, তাহলে তাকে গ্রহণ করা যায়। কারণ, যখন শাসনের মূল উদ্দেশ্য রাজতন্ত্র ব্যতীত হাসিল হওয়া কষ্টকর হয়, তখন রাজতন্ত্রকে বৈধকরণ ছাড়া উপায় নেই। সর্বোপরি রাজতন্ত্রকে আবশ্যক ও ঐচ্ছিক সাব্যস্ত করার বিষয়টা নিতান্তই ইজতিহাদি বিষয়।

এই বিষয়ে ইতিহাসে দুটি পক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথমপক্ষ, এরা সর্বাবস্থায় এবং সব সময়ই সবার ওপর খিলাফত প্রতিষ্ঠা ওয়াজিব মনে করেন। তাই এই পক্ষটি মূলত যারা খিলাফতকে পরিত্যাগ করেছে, তাদেরও নিন্দা করেন। আবার যারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে

---

[৪৮]. আহমাদ : ১৬৯৩৩, *ইবনে আবি শাইবা* : ৩১৩৫৮

পরিত্যাগ করেছেন, তাদেরও নিন্দা করেন। এমনটাই বিদআতপন্থি খারেজি, মুতাজিলা ও সুফি সম্প্রদায়সহ আরও কয়েকটি সম্প্রদায় মনে করে।

দ্বিতীয়পক্ষ, এই দলটি মনে করে সর্বাবস্থাই রাজতন্ত্র বৈধ; চাই তা খলিফাদের সুন্নাহর পরিপন্থি হোক, আর পক্ষে হোক। যেমনটা জুলুমবাজ স্বৈরাচারী শাসক ও মুরজিয়াদের একটা গোষ্ঠী মনে করে। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

শাসনব্যবস্থাকে খিলাফত থেকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করার পেছনে কয়েকটা সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে—

১. হয়তো নবুয়তি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় জনগণের অক্ষমতা রয়েছে।

২. কিংবা কোনো গ্রহণযোগ্য ইজতিহাদ রয়েছে।

৩. অথবা খিলাফত প্রতিষ্ঠার আমলি ও ইলমি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে না।

যদি ইলমি ও আমলি অপারগতার দরুন খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা না যায়, তাহলে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকারীকে অপারগ বা মাজুর হিসেবে বিবেচনা করা হবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা থাকলে তা প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব। তবুও যেহেতু অপারগতার দরুন শরিয়তের অনেক হুকুম রহিত হয়ে যায়, তেমনি এটাও রহিত হয়ে যাবে। যেমন : বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করতে পারেননি তাঁর সম্প্রদায়ের কারণে। তাঁর এই অবস্থাটা সাইয়্যিদুনা ইউসুফ (আ.)-এর সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্য রাখে। তবে এখানে মনে রাখতে হবে, কতিপয় নবির জন্য রাজতন্ত্র বৈধ ছিল। যেমন : সোলায়মান (আ.), ইউসুফ (আ.), দাউদ (আ.)।

আর খিলাফত প্রতিষ্ঠার ইলমি ও আমলি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য নবিদের শরিয়তের ওপর বিবেচনা করে কেউ যদি ধরে নেয় যে খিলাফত মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয় এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন, তাহলেও শাসকের এই মতামতকে হক মনে করা হবে। সে যদি ন্যায়পরায়ণ হয়, তাহলে তার কোনো গুনাহ হবে না।

কাজি আবু ইয়ালা তাঁর *আল মুতামাদ* গ্রন্থে মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতকে প্রমাণ করতে গিয়ে এই বিষয়টির অবতারণা করেছেন। তিনি তাঁর ইসলামকে

সমুন্নত করা, ন্যায়পরায়ণতা ও উত্তম চরিত্রের ওপর ভিত্তি করেই এসব বলেছেন। তা ছাড়া তিনি তাঁর নেতৃত্বকে সাব্যস্ত করেছেন আলি (রা.)-এর মৃত্যুর পর যখন হাসান (রা.) তাঁর হাতে বাইয়াতবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই সময়টাকে 'আমুল জামাত' বা সংঘবদ্ধতার বছর বলা হয়। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি হাদিস বর্ণনা করেন—

> 'ইসলামের চাকা ৩৫ হিজরির শেষ ভাগ পর্যন্ত থাকবে।'[৪৯]

ইমাম আহমদ (রহ.) ইবনুল হাকামের রেওয়ায়েত সম্পর্কে বলেন—

> 'ইমাম জুহরি (রহ.) থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেন—"মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকাল পাঁচ বছর ছিল।" এতে আপত্তির অবকাশ নেই। অতএব, এটা রাসূলের হাদিসে বর্ণিত, "৩৫ হিজরি" কথাটির সাথে সংগতিপূর্ণ।'

ইবনুল হাকাম (রহ.) বলেন—

> 'আমি আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে বললাম—"কে বলেছে ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত এই হাদিসে মুয়াবিয়া (রা.)-এর কথা বলা হয়েছে?" ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বললেন—"রাসূল ﷺ এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য দিয়েছেন নিজের অবস্থান থেকে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া একজন নবির কাজ নয়।"'

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর বক্তব্যের সাধারণ পাঠোদ্ধার হলো, তিনি হাদিসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফত হিজরি ৩৫তম বছর পর্যন্ত ছিল। বলা হয়, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে খিলাফত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন—

> 'মদিনায় যেসব বাইয়াত হয়েছে, তা আমাদের কাছে খিলাফত।'

কাজি আবু ইয়ালা বলেন—

> 'ইমাম আহমদ (রহ.)-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, মদিনার বাইরে যেসব বাইয়াত হয়েছে, তা নবুয়তি খিলাফত ছিল না।

---

[৪৯]. আবু দাউদ : ৪২৫৪, আহমাদ : ৩৭০৭

আমি মনে করি, নবুয়তি খিলাফত আলি (রা.)-এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। এর সপক্ষে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর বক্তব্য ও মতামত বেশি।'

তবে এতটুকু বলার পর ইমাম কাজি আবু ইয়ালা 'খিলাফত ৩০ বছর। তারপর রাজতন্ত্র কায়েম হবে'—হাদিসটি নিয়ে একটি আপত্তির কথা উল্লেখ করেন। প্রশ্নকারী বলেন—'সুনির্দিষ্টভাবে যেহেতু ৩০ বছর নবুয়তি খিলাফত থাকার কথা বলা হয়েছে, তাই খিলাফত শেষ হয়েছে আলি (রা.)-এর মাধ্যমে। তাঁর পরের সময়টি ছিল রাজতন্ত্রের। তাই মুয়াবিয়া (রা.)-এর সময়-পর্বটি খিলাফতের সময় ছিল না।'

কাজি আবু ইয়ালা এর জবাবে বলেন—'এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে, রাসূল ﷺ উক্ত হাদিসটিতে "খিলাফত" শব্দটি দিয়ে বুঝিয়েছেন এমন খিলাফত, যা রাজতন্ত্রমুক্ত হবে।'

আর বাস্তবেও তা-ই ছিল; চার খলিফার খিলাফত ছিল রাজতন্ত্রমুক্ত। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফত রাজতন্ত্রমুক্ত ছিল না। আর এটা তাঁর খিলাফতের জন্য দূষণীয় কোনো বিষয় না। যেমনটা সোলাইমান (আ.)-এর রাজতন্ত্র তাঁর নবুয়তের জন্য দূষণীয় বিষয় নয়; যদিও তিনি ছাড়া প্রায় সব নবিই ছিলেন বিত্তহীন।

খিলাফত ও রাজতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারে কি

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, খিলাফতের সাথে রাজতন্ত্রের মিশ্রণ আমাদের শরিয়তে জায়েজ এবং এটা ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক নয়। তবে বিমিশ্র খিলাফত বা নিরেট খিলাফতই সর্বোত্তম পন্থা।

অতএব, মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে যারা একাত্মতা পোষণ করেন এবং মুয়াবিয়া (রা.)-কে মুজতাহিদ জ্ঞান করে তাঁকে গুনাহগার মনে করে না, তাদের দুটি বক্তব্যের একটি অবলম্বন করতে হবেই—

এক. তাদের বলতে হবে, খিলাফতের সাথে রাজতন্ত্রের মিশ্রণ বৈধ।

দুই. অথবা বলতে হবে, এক্ষেত্রে কোনো নিন্দা করা যাবে না।

মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতো বিদআতপন্থি লোকেরা আলি (রা.)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াসহ আরও কিছু কারণে মুয়াবিয়া (রা.)-কে ফাসিক বলে থাকে। তাদের যুক্তি হলো—'তিনি কবিরা গুনাহ করেছেন। আর কবিরা গুনাহকারীকে ফাসিক বলা আবশ্যক। তাই দুটি বিষয়ের (কবিরা গুনাহ করা এবং এর দরুন ফাসিক হওয়া) যেকোনো একটিকে অবশ্যই নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করতে হবে। তা না হলে কবিরা গুনাহ করা যদি রাজার জন্য বৈধ হয়ে যায়, তাহলে কাজি ও আমিরদের জন্যও বৈধ হয়ে যাবে।'

খিলাফত ত্যাগ করার হুকুম

খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ খিলাফত প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত থাকে, তাহলে এই ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়াটা নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে সে যদি সগিরা গুনাহ মনে করে এটাকে ত্যাগ করে, তাহলে এটা তার ন্যায়পরায়ণতার প্রতিবন্ধক নয়। সে ইনসাফকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি সে কবিরা গুনাহ মনে করে ছেড়ে থাকে, তাহলে দ্বিবিধ বক্তব্য পাওয়া যায়।

রাজতন্ত্রী অথবা ইমারতপন্থি শাসক যদি আদিষ্ট ভালো কাজগুলো পালন করে এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকে আর এভাবে যদি তার সওয়াবের তুলনায় গুনাহ কম হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে সে সৎ। আর কেউ যদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সত্ত্বেও এসব কর্তব্য পালনে ত্রুটি করে, তাহলে তিন অবস্থা—

১. হয়তো শাসকের ভালো কাজ জনগণের ভালো কাজের চেয়ে কম হবে;
২. অথবা বেশি হবে
৩. অথবা সমান হবে।

যদি বেশি হয়, তাহলে সে উত্তম। আর কম হলে অনুত্তম। সমান হলে সমকক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে। সওয়াব ও শাস্তির ব্যাপারে এটাই কুরআন-সুন্নাহ ও ইনসাফের দাবি।

এ বক্তব্যটি তাদের কথার ওপর ভিত্তি করে আমরা বলেছি, যারা কিয়ামতে বিচার ও আদালতের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ আমলকে একসঙ্গে মাপা ও তুলনা করা হবে বলে বিশ্বাস করে। আর যারা বিশ্বাস করেন, হাজার ভালো কাজ

করা সত্ত্বেও একটি কবিরা গুনাহই মানুষের দোজখে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট, তাদের কথা এখানে আমরা আনছি না। (অর্থাৎ মুতাজিলাদের কথা। যেমনটা আমরা একটু আগে পড়ে এসেছি।) কেননা, প্রথম মতামতটিই সবচেয়ে প্রমাণসিদ্ধ ও দালিলিক।

বৃহত্তম স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতম স্বার্থ বিসর্জনের হুকুম

এখানে একটি মাসয়ালা আলোচনা করে নেওয়া দরকার। পাপের আশ্রয় ব্যতীত যদি অতীব ভালো কাজ না করা যায়, তাহলে দুটি অবস্থা—

প্রথম অবস্থা : যদি অবৈধ কাজ ছাড়া সেই ভালো কাজটি করা অসম্ভব হয়, তাহলে সেই অবৈধ কাজ আর অবৈধ বা নাজায়েজ থাকে না। কারণ, ওয়াজিব যা ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না কিংবা মুস্তাহাব যা ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না, তাও ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব। অর্থাৎ ওয়াজিব বিষয়টি পালনে যা যা করতে হয়, সেগুলো ওয়াজিব। আর মুস্তাহাব বিষয় পালন করতে যা যা করা লাগে, তাও মুস্তাহাব। তাই এতে যদি অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গলই বেশি থাকে, তাহলে তা 'মাহজুর' বা 'অবিধিবদ্ধ' থাকে না; বরং জায়েজ হয়ে যায়। যেমন : অপারগ ব্যক্তির জন্য মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া এবং ঠান্ডার সময় রেশমি কাপড় পরা ইত্যাদি বিষয় মানুষের অপারগতাকে বিবেচনায় রেখে জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়। ফিকহের কিতাবে এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, অধিকাংশ মানুষ শুধু এতটুকই অনুভব করে—কাজটি খারাপ; কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রয়োজনের প্রতি তারা খেয়াল করে না। অথচ ভালো কাজটির গুরুত্ব ও নেকি এত বেশি যে, খারাপ কাজটি সেখানে নিতান্তই গৌণ। (সুতরাং পরিস্থিতিকে গুরুত্ব না দিয়ে কেউ যদি খারাপ কাজটির কারণে একটি অধিক ভালো কাজ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে একটি অতীব ভালো ও পুণ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করল।—অনুবাদক

এভাবেই যদি একান্তই কোনো জরুরত বা বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়, তাহলে 'মাহজুর' বা 'অবিধিবদ্ধ' বিষয়টি 'মাহবুব' বা প্রিয় হয়ে যায় কিংবা মুবাহ হয়ে যায়। একইভাবে মুবাহ বিষয়ে কিংবা ওয়াজিব ও মুস্তাহাব বিষয়ে যখন অমঙ্গলের প্রাধান্য বিরাজ করে, তখন তা হারাম হয়ে যায় কিংবা অনুত্তম কাজে রূপান্তরিত হয়। যেমন : অসুস্থ ব্যক্তির রোজা রাখা

এবং এমন ব্যক্তি—যার পানির দ্বারা প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে, তার পানি ব্যবহার করা। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'যারা তাঁকে নাহকভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, তাদের ধ্বংস হোক। তাঁরা যখন জানে না, তখন কেন তাঁরা প্রশ্ন করে জানল না? অজ্ঞতার একমাত্র প্রতিষেধক হলো প্রশ্ন।'[৫০]

প্রয়োজন সাপেক্ষে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া এবং মাহজুর বা অবাঞ্ছিত কাজ করা জায়েজ।

এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, প্রয়োজন সাপেক্ষে কিছু ওয়াজিব যেমন ছেড়ে দেওয়া যায় এবং কিছু অবিধিবদ্ধ তথা অবাঞ্ছিত কাজও করা যায়, তেমনি কখনো কখনো খলিফাদের সুন্নাহ থেকেও বের হওয়া যায়; যদি তাঁদের কিছু সুন্নাহ পালনে অক্ষমতা এবং কিছু নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা নিতান্তই অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন : অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত রাষ্ট্রপরিচালনার কাঙ্ক্ষিত দায়িত্বগুলো আদায় করা যাচ্ছে না।

খিলাফতকে ত্যাগ করার বিষয়টিও অনুরূপ; যেমনটা আমরা আগেও বলেছি। আর এটা কতিপয় জালিম ও জাহেল বিদআতপন্থিরা ছাড়া সবাই মানে।

গুনাহহীন কষ্টসাধ্য ভালো কাজের হুকুম

দ্বিতীয় অবস্থা : গুনাহহীনভাবেই ভালো কাজটি করা সম্ভব। তবে তা এতটাই কষ্টসাধ্য যে, প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে হয়। অথবা কাজটা এতটাই অপছন্দনীয় হয় যে, প্রবৃত্তি বা মানবপ্রকৃতি এই অতীব ভালো কাজে উৎসুক হয় না; হোক সেই কাজটি ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব।

---

৫০. হাদিসটির পূর্ণরূপ হলো—একজন সাহাবি আঘাত পেয়ে অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি এখন তায়াম্মুম করতে পারব?' সাহাবিরা বলেছিলেন—'না, তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম।' তারপর সাহাবি পানি ব্যবহার করেন এবং মারা যান। রাসূল ﷺ বিষয়টি অবগত হওয়ার পর উক্ত কথাগুলো বলেন। আবু দাউদ : ৩৩৬, আহমাদ : ৩০৫৭

যদি না সে কাজটি করতে গিয়ে এমন কিছু করে বসে, যা নিষিদ্ধ এবং যার গুনাহ ভালো কাজের কল্যাণের তুলনায় কম। এই অবস্থার সম্মুখীন অনেককেই হতে হয়। শাসক, রাজনীতিবিদ, মুজাহিদ, আলিম, কাজি বা বিচারক, কালামবিদ, সুফি ও সাধারণ মানুষগণও এই অবস্থার সম্মুখীন হন। যেমন : হুদুদ কায়েম করা, নাগরিক নিরাপত্তা, রাষ্ট্রের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা, সম্পদ বণ্টন, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ ইত্যাদি রাষ্ট্রের কল্যাণের সাথে জড়িত কর্মসমূহ পালন করতে গিয়ে নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। সম্পদ আত্মসাৎ করা, মানুষের ওপর দখলদারিত্ব করা, সম্পদ বণ্টনে পক্ষপাত করা ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তিতাড়িত কাজে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন।

একইভাবে জিহাদের ক্ষেত্রে কেউ অযাচিত ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হলো কিংবা ইলম চর্চার ক্ষেত্রে ফিকহ ও উসুলুদ-দ্বীন বা দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি চর্চা করতে গিয়ে নিজস্ব মত দ্বারা চালিত হলো এবং এসব বিষয়ে কালামশাস্ত্র দ্বারা তাড়িত হলো কিংবা শরয়ি ইবাদতবিষয়ক ইলম ও আল্লাহর মারেফতের ইলমচর্চার বেলায় রাহবানিয়াত বা বৈরাগ্যতায় লিপ্ত হলো। এই জাতীয় বিষয় রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রচুর দেখা যায়। তা শাসক, আমির, কাজি, আলিম, আবেদ সবার মাঝেই দেখা যায়। যার দরুন সমাজে ফিতনা দেখা দেয়। তাই বাধ্য হয়ে করা এ নিষিদ্ধ কাজগুলোই কেবল এক দলের চোখে পড়ে। তারা তাদের নিন্দা এবং ঘৃণা করে। আরেক দলের কেবল এদের ভালো কাজগুলোই চোখে পড়ে, তারা তাদের ভালোবাসে। তাই প্রথম দল তাদের ভালো কাজগুলো খারাপ বিবেচনা করে এবং দ্বিতীয় দল খারাপকে ভালো মনে করে।

এ বিষয়ক মূলনীতি আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি। রাষ্ট্রের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বা ওয়াজিব কোনো কিছু আদায় করাটা যদি রাজতান্ত্রিক নীতি ছাড়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়, তখন রাজতন্ত্র কি মুবাহ বা জায়েজ হয়ে যাবে, যেমনটা অপারগতার সময়ে মুবাহ হয়ে যায়? আমরা এ প্রসঙ্গে দুটি মত উল্লেখ করেছি। যদি দুষ্করতাকে অপারগতার স্থলাভিষিক্ত করা হয়, তাহলে এটা কোনো গুনাহ হবে না। আর যদি স্থলাভিষিক্ত না করা হয়, তাহলে গুনাহ হবে। আর যে কাজে কোনো দুষ্করতা ও অপারগতা নেই, তাতে খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহকে না মানা কুপ্রবৃত্তির অনুগমন বলে বিবেচিত হবে।

প্রকৃত অর্থে ভালো কাজ ভালোই, আর খারাপ কাজ খারাপই। মানুষ ভালো কাজে খারাপের মিশ্রণ করে এবং খারাপ কাজের সাথে ভালোর মিশ্রণ করে। শরিয়তের বিধান অনুযায়ী তাদের খারাপ কাজটি অনুমোদিত নয় কিংবা শরিয়ত এর নির্দেশও দেয় না।

শরিয়তের দৃষ্টিতে তাদের অপারগতা যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে তাদের কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অজুহাত বা অপারগতাকে গ্রহণ করা হবে না। তবে ভালো কাজের বেলায় অবশ্যই তারা আদিষ্ট; বরং এক্ষেত্রে তাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হবে। তবে শর্ত হলো—কাজটি এমন হতে হবে, যা হালকা মন্দকর্ম ছাড়া সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। যেমনটা ঘটে থাকে জিহাদের ময়দানে; বাধ্য হয়ে এবং অনিচ্ছাবশত জুলুম হয়ে যায়, অথচ জিহাদটির কল্যাণের তুলনায় জুলুম বা অকল্যাণের পরিমাণ সামান্য।

অনুরূপভাবে, যদি এমনটা নিশ্চিত জানা যায় যে, সেই সব মন্দ কাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলে লোকেরা এমন ওয়াজিব ও গুরুত্বপূর্ণ ভালো কাজও পরিত্যাগ করবে—যা করতে কোনো নিষেধ বা বাধা নেই, তাহলে এই অবস্থাতেও শিথিলতাকে বৈধ মনে করা হবে। কেননা, এই নিষেধাজ্ঞার মাঝে ওয়াজিব ত্যাগের নেতিবাচক দিক আছে। তবে যদি এই দুটোর সমন্বয় সম্ভব হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে পূর্ণ ওয়াজিবই আদায় করবে। যেমন : কর্মদক্ষতা ও পারদর্শিতার বিবেচনায় উমর (রা.) এমন লোককেও কাজে নিয়োগ দিতেন, যার ভেতরে পাপাচারের মনোভাব আছে। তারপর তিনি নিজ ন্যায়পরায়ণতা ও ব্যক্তিত্বের ক্ষমতাবলে তার ভেতর থেকে পাপাচারিতাকে দূর করতে সক্ষম হতেন।

এসব বিষয়ে (খারাপ কাজে) নিষেধ করা বা প্রতিবাদ করাকে পরিহার করাটা মূলত অপরাধকে স্বহস্তে প্রতিবাদ করা অথবা অস্ত্রসহ প্রতিহত করাকে ছেড়ে দেওয়ার মতোই একটি বিষয়।[৫১] কেননা, উপরিউক্ত অবস্থার ক্ষতিটি অপরাধ প্রতিহতকারীর ক্ষতির চেয়ে আরও বড়ো ও ব্যাপক ক্ষতি বয়ে আনে।

---

৫১. শাইখুল ইসলাম (রহ.) এখানে যে হাদিসটির ইঙ্গিত দিয়েছেন তা হলো, রাসূল ﷺ বলেন—

> 'তোমাদের কেউ কোনো অপরাধ হতে দেখলে সে যেন তা স্বহস্তে প্রতিহত করে।' মুসলিম : ৪৯

তাই কোনো নিষেধাজ্ঞার ফলে যখন আবশ্যিকভাবে নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে অতি উত্তম কোনো কাজকে পরিত্যাগ করার পরিস্থিতি তৈরি হবে, তখন সেই নিষেধাজ্ঞাটি আবশ্যিকভাবেই অতি মন্দ কাজকে ডেকে আনবে। যেমন : কেউ একজন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার বদলে দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়ার শর্তে ইসলাম গ্রহণ করল (এমনটা রাসূলের সময়ে ঘটেছে) কিংবা কোনো জালিম শাসক মদ পান বা এ জাতীয় কোনো হারাম কাজের শর্তে ইসলাম গ্রহণ করল। সেক্ষেত্রে তাকে যদি বাধা দেওয়া হয়, তাহলে সে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যাবে।[৫২]

সুতরাং একজন আলিম বা শাসকের নিষেধাজ্ঞাতে বিশেষ কোনো অকল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে নিষেধ করা থেকে বিরত থাকার মাঝে আর কাজটি সম্পাদন করার আদেশ দেওয়ার মাঝে পার্থক্য আছে। অবস্থা অনুপাতে বা পরিস্থিতিভেদে আদেশ ও নিষেধের প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এসব পরিস্থিতি ছাড়া অন্য অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা আবশ্যক। হতে পারে এই নিষেধাজ্ঞাটি হারামের হুকুম বর্ণনার জন্য অথবা হারামের বিশ্বাস তৈরির জন্য কিংবা সে কাজের ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শনের জন্য বা সে কাজ পরিহার করবে এমন আশায় অথবা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই রাসূল ﷺ কর্তৃক কোনো কাজ করার আদেশ-নিষেধ, জিহাদ, ক্ষমা, হুদুদ কায়েম এবং কঠোরতা ও নম্রতার অবস্থায় বৈচিত্র্য দেখা যায়।

---

[৫২]. যেমন : উল্লিখিত ক্ষেত্রে লোকটিকে যদি এই শর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে দেওয়া না হতো—তথা তাকে নিষেধ করা হতো, তখন এই নিষেধাজ্ঞাটি অতি মন্দ একটি কাজ তথা লোকটির জন্য কুফরের দরজা উন্মুক্ত করে দিত।—অনুবাদক

পূর্বেকার শরিয়ত ও আমাদের শরিয়তে রাজতন্ত্র

পূর্বেকার শরিয়তে রাজতন্ত্র

ইতঃপূর্বেই আলোচনা করেছি, আমাদের পূর্বেকার শরিয়তে রাজতন্ত্রের বিধান কী ছিল। আমাদের শরিয়তে রাজতন্ত্র কি বৈধ? নবুয়তি খিলাফত মুস্তাহাব, নাকি আরও উত্তম কিছু? নাকি ওয়াজিব? নাকি নবুয়তি খিলাফত বাদ দিয়ে রাজতন্ত্র গ্রহণ করা কেবল তখনই বৈধ হবে, যখন কোনো অপারগতা দেখা দেবে; যেমনটা অপরাপর ওয়াজিবের বেলায় হয়ে থাকে?

পূর্বেকার শরিয়তে রাজতন্ত্র বৈধ ছিল। আল্লাহ তায়ালা কখনো কখনো নবি ও সৎকর্মকারীদের ধন-সম্পদও দান করেছেন। যেমন : দাউদ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ-

'আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং তাঁর যা ইচ্ছা শিক্ষা দিয়েছেন।' সূরা বাকারা : ২৫১

সোলায়মান (আ.) সম্পর্কে বলেছেন—

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ-

'হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন—যা আমার পরে আর কারও জন্য প্রযোজ্য হবে না। নিশ্চয়ই আপনি পরম দানশীল।' সূরা সোয়াদ : ৩৫

ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে বলেছেন—

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ-

'হে রব! আপনি আমাকে রাজত্ব দিয়েছেন এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন।' সূরা ইউসুফ : ১০১

এই তিনজন নবিকে আল্লাহ নিজেই রাজত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন—

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا- فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ بِه وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا-

'নাকি আল্লাহ তাঁদের ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন, সেজন্য লোকেরা হিংসা করে? অতএব, আমি ইবরাহিমের বংশধরদের কিতাব ও প্রজ্ঞা দিয়েছি এবং দিয়েছি মহান রাজত্ব। তাই তাদের কেউ ঈমান এনেছে এবং কেউ বিরত থেকেছে। আর দগ্ধকারী হিসেবে জাহান্নামই যথেষ্ট।' সূরা নিসা : ৫৪-৫৫

এখানে ইবরাহিম ও দাউদ (আ.)-এর বংশধরদের রাজত্ব দেওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ-

'যাকে খুশি তুমি রাজত্ব দাও।' সূরা আলে ইমরান : ২৬

এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম মুজাহিদ (রহ.) খোদ নবুয়তকেই 'রাজত্ব' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

নবুয়ত, রাজত্ব এবং নবিদের তিনটি অবস্থান

নবুয়তের কিছু অংশ অনেকটা রাজক্ষমতার মতো। নবিদের কাউকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং তাঁদের অনুসরণ ও আনুগত্য করা হয়নি। তাঁরা হলেন রাজত্বহীন নবি। আবার নবিদের কাউকে অনুসরণ ও আনুগত্য করা হয়েছে। এই মান্য হওয়ার মাধ্যমেই তিনি রাজ্যাধিকারী হয়ে ওঠেন। তবে নবি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন, শুধু যদি তা-ই করতে অনুসারীদের আদেশ দেন, তাহলে তাঁকে বলা হবে 'বান্দা রাসূল'। তাঁর কোনো রাজত্ব নেই। আর নবি নিজে যা মুবাহ বা জায়েজ মনে করেন, তাও যদি অনুসারীদের আদেশ দেন, তাহলে তিনি রাজা বলে বিবেচিত হবেন। যেমন : সোলায়মান (আ.)-কে বলা হয়েছে—

هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

'এটা আমার অনুগ্রহ—তুমি এটা অন্যকে দান করো অথবা নিজের জন্য রেখে দাও, এর কোনো হিসাব নেওয়া হবে না।' সূরা সোয়াদ : ৩৯

অতএব, তিনি হলেন রাজা বা 'বাদশাহ নবি', যা 'বান্দা নবি'র বিপরীত। যেমনটা রাসূলকে বলা হয়েছে—'আপনি চাইলে "রাজা নবি" হতে পারেন কিংবা 'বান্দা নবি" হতে পারেন।'

'বান্দা নবি'-এর ব্যাখ্যা হলো—আনুগত্য ও অনুসরণ করা, যা নবুয়ত ও রিসালাতের একটি প্রকার এবং এই বিষয়গুলো নবুয়তকে পূর্ণতা দান করে। এটা আমাদের নবির মধ্যে ছিল। কেননা, তিনি ছিলেন বান্দা নবি। অনুসৃত ও মান্য। তাই তিনি অনুসৃত হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছেন, যেন তিনি অনুসারীদের আদর্শ হয়ে মানবসমাজকে উপকৃত করতে পারেন। তারা তাঁর ওপর রহম করতে পারে এবং তিনিও যেন তাদের অনুগ্রহ করতে পারেন। তিনি রাজা হননি, যাতে করে রাজতন্ত্রে থাকা ক্ষমতা ও সম্পদের সম্ভোগ আখিরাতে তাঁর প্রতিদানে ঘাটতি বয়ে না আনে। তাই আল্লাহর কাছে রাজা রাসূলের চেয়ে বান্দা রাসূলই প্রিয়। তাই ইবরাহিম, নুহ ও মুসা (আ.)-এর অবস্থান সোলায়মান, দাউদ ও ইউসুফ (আ.)-এর চেয়ে মহত্তম। তাই সত্য যা-ই হোক, আহলে কিতাবের অনেকেই দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-এর নবুয়তের ওপর আপত্তি করেছে, যেমনটা সাধারণ মানুষ অনেক সময় বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী লোকদের শাসন সম্পর্কে করে থাকে।

সৎ রাজা-বাদশাহ এবং সাধারণ রাজা-বাদশাহদের ঐতিহ্য

আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ-

'আল্লাহ অবশ্যই তালুতকে তোমাদের রাজা করে পাঠিয়েছেন।' তারা বলল—'আমাদের ওপর তাঁর রাজত্ব কীভাবে হবে অথচ আমরা তাঁর চেয়ে রাজত্বের বেশি হকদার এবং তাঁকে প্রচুর ঐশ্বর্যও দেওয়া হয়নি!' তিনি বললেন—'আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাঁকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। বস্তুত আল্লাহ যাকে ইচ্ছে স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আর আল্লাহ সর্বব্যাপী প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' তাদের নবি তাদের বললেন—'তাঁর রাজত্বের নিদর্শন হলো "তাবুত" আসবে।' সূরা বাকারা : ২৪৭-২৪৮

আল্লাহ আরও বলেন—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا- إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا-

'তারা তোমাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলো, আমি তোমাদের তাঁর বর্ণনা শোনাব। আমি তাঁকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং প্রতিটি বিষয়ের উপায় ও পন্থা বাতলে দিয়েছি।' সূরা কাহাফ : ৮৩-৮৪

মুজাহিদ (রহ.) বলেন—'দুজন কাফির ও দুজন মুমিন পৃথিবীকে শাসন করেছে। মুমিন দুজন হলেন সোলায়মান (আ.) ও জুলকারনাইন। আর কাফির দুজন হলেন বুখতে নাসর ও নমরুদ। এই উম্মতের পঞ্চম আরেকজন ব্যক্তি পৃথিবীকে শাসন করবেন।'

আল্লাহ আরও বলেছেন—

يَا قَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكًا-

'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে, তা স্মরণ করো। তিনি তোমাদের মধ্যে নবিদের পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের রাজা বানিয়েছেন।' সূরা মায়েদা : ২০

কুরআনে রাজা (مَلِكٌ) শব্দটি অনেকবার এসেছে। যেমন—

وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا-

'তাঁদের পেছনে এমন এক রাজা রয়েছে, যে প্রতিটি নৌকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।' সূরা কাহফ : ৭৯

এ ছাড়াও যেমন—

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْ اَرٰى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ-

'রাজা বলেন—নিশ্চয়ই আমি সাতটি দুর্বল গাভি সাতটি মোটাতাজা গাভিকে খেতে দেখেছি।' সূরা ইউসুফ : ৪৩

সমাজে ইমাম বা শাসকদের অবস্থান

কুরআন, ইনসাফ ও তরবারি দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ রাসূল ﷺ-কে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও সত্য ধর্ম দিয়ে, যাতে তিনি এই ধর্মকে সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয় লাভ করাতে পারেন। তাই আল্লাহ এই উম্মতের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং নিয়ামতে পূর্ণ করেছেন। তিনি শাসনের জন্য একটি বিধান দিয়ে তা অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। আর জ্ঞানহীনদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাবকে অপরাপর কিতাবের ওপর প্রভুত্বকারী ও সত্যায়ক বানিয়েছেন। তাঁর জন্য আরও দিয়েছেন শরিয়ত ও জীবনবিধান। তাঁর উম্মতের জন্য দিয়েছেন হিদায়াতের বহুবিধ পন্থা।

দ্বীন কায়েম হবে কেবল কিতাব, ইনসাফ ও তরবারির মাধ্যমে। কিতাব পথপ্রদর্শন করবে। তরবারি তাকে সহযোগিতা করবে। আল্লাহ বলেন—

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ-

'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের প্রেরণ করেছি প্রমাণাদি দিয়ে এবং তাঁদের সাথে দিয়েছি কিতাব ও ইনসাফ—যাতে মানুষ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর দিয়েছি তরবারি[৫৩], যাতে রয়েছে মানুষের জন্য প্রচুর ক্ষমতা ও উপকার।' সূরা হাদিদ : ২৫

---

৫৩. কুরআনে মূল শব্দ اَلْحَدِيْدَ লোহা রয়েছে, যা দ্বারা রূপক অর্থে তরবারিকে নির্দেশ করে।

সুতরাং কিতাব দিয়ে জ্ঞান ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা পায়। মিজান বা ইনসাফ দিয়ে অর্থনৈতিক চুক্তি ও অধিগ্রহণের অধিকার সাব্যস্ত হয়। আর তরবারি দিয়ে হুদুদ কায়েম হয় কাফির ও মুনাফিকদের ওপর।

তাই পরবর্তী যুগে কিতাব ছিল আলিম ও আবেদগণের চর্চায়। মিজান ছিল মন্ত্রী, আমলা, দাপ্তরিকদের চর্চায়। আর তরবারি ছিল শাসক ও সৈন্যদের চর্চায়। ভিন্ন ভাষায়—নামাজে কিতাব আর জিহাদে তরবারি।

সবচেয়ে বেশি আয়াত ও হাদিস নামাজ ও জিহাদ সম্পর্কে

তাই রাসূল ﷺ যখনই কোনো রোগীকে দেখতে যেতেন, বলতেন—

> 'হে আল্লাহ! তোমার বান্দাকে তুমি সুস্থ করে দাও। (সুস্থ হয়ে) তোমার জন্য নামাজে সে হাজির হবে এবং তোমার শত্রুকে আঘাত করবে।'[৫৪]

রাসূল ﷺ আরও বলেন—

> 'সবকিছুর মূল ইসলাম। ইসলামের মূল নামাজ। আর এর সর্বোচ্চ শিখর হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।'[৫৫]

তাই কুরআনে এই দুটোকে (নামাজ ও জিহাদ) অনেক জায়গায় একসঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে—

> إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ-

> 'তাঁরাই হলো মুমিন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান আনার পর সন্দেহ করেনি এবং তাঁদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।' সূরা হুজুরাত : ১৫

নামাজ হলো ইসলামের অগ্রগণ্য আমল এবং ঈমানি আমলের মূল। তাই কুরআনে একে ঈমান শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে—[৫৬]

---

[৫৪]. আবু দাউদ : ৩১০৭, আহমাদ : ৬৬০০

[৫৫]. তিরমিজি : ২৬১৬, আহমাদ : ২২০১৬, ইবনে মাজাহ : ৩৯৭৩

[৫৬]. ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর মতে—ওপরের আয়াতটিতেও (হুজুরাত : ১৫) ঈমান শব্দ দিয়ে অপরাপর ঈমানি আমলের সাথে সাথে নামাজকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ -

'আর আল্লাহ এরূপ নন যে তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবেন।' সূরা বাকারা : ১৪৩

সালাফদের মতে, এখানে ঈমান অর্থ নামাজ। অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখী তোমাদের নামাজ। আল্লাহ বলেন—

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

'হাজিদের পানি পান করানো আর মসজিদে হারামের আবাদ করাকে তোমরা কি তাঁদের কাজের সমান মনে করো, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর দৃষ্টিতে এরা সমান নয়। (যারা ভ্রান্ত পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি) খোঁজে এমন জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না।' সূরা তাওবা : ১৯

তিনি আরও বলেন—

فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَه اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ-

'অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় প্রেরণ করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন। তাঁকেও তাঁরা ভালোবাসবে। তাঁরা মুমিনদের ওপর নমনীয়, কাফিরদের বেলায় কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো নিন্দুকের নিন্দার তোয়াক্কা করবে না।' সূরা মায়েদা : ৫৪

তাঁদের গুণ বর্ণনায় 'ভালোবাসা' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন, যেটা নামাজের প্রকৃত গূঢ়ার্থ। যেমনটা তিনি বলেছেন—

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا۔

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে, তাঁরা পরস্পরে নম্র এবং কাফিরদের বেলায় কঠোর। তাঁদের তুমি দেখবে রুকুকারীরূপে, সিজদারত হয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করছে।' সূরা ফাতহ : ২৯

এখানে তাঁদের গুণ বলতে গিয়ে কুফর ও গোমরাহির ক্ষেত্রে কঠোরতার কথা বলেছেন। সহিহ হাদিসে এসেছে—

'নবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো—"কোন আমলটি উত্তম?" তিনি বললেন—"আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" তারপর জিজ্ঞেস করা হলো, "এরপর কোন কাজ উত্তম?" "মকবুল হজ।"'[৫৭]

অথচ অন্য একটি সহিহ হাদিসে এসেছে, ইবনে মাসউদ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন—

'কোন আমল উত্তম?' নবিজি বললেন, 'ওয়াক্তমতো নামাজ।' ইবনে মাসউদ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন—'তারপর কোনটা?' তিনি বললেন, 'পিতা-মাতার সাথে সদ্‌ব্যবহার।' আবার জিজ্ঞেস করলেন—'তারপর কোনটা?' নবিজি বললেন—'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।'[৫৮]

প্রথম হাদিসে 'আল্লাহর ওপর ঈমান' কথাটিতে নামাজও অন্তর্গত। তবে প্রথম হাদিসটিতে পিতা-মাতার প্রতি সদ্‌ব্যবহার কথাটি নেই। কারণ, পিতা-মাতা তো সবার থাকে না। তাই প্রথমটি ব্যাপক এবং দ্বিতীয়টি যার পিতা-মাতা আছে তার জন্য নির্দিষ্ট।

---

[৫৭]. বুখারি : ১৫১৯, মুসলিম : ৮৩

[৫৮]. বুখারি : ৫২৭

জিহাদ ও নামাজে নেতৃত্ব দেবেন শাসক

রাসূলের যুগে, চার খলিফার আমলে এবং তাঁদের পথানুসারী আব্বাসি ও উমাইয়া শাসকদের যুগে নামাজ ও জিহাদ—এই মৌলিক দুই বিষয়ে নেতৃত্বে থাকতেন শাসকরাই। তাই যিনি নামাজের ইমাম, তিনিই জিহাদের ইমাম। রাষ্ট্রের ভেতরে ও বাইরে জিহাদ ও নামাজের আদেশ অভিন্ন। তাই রাসূল ﷺ যখন আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা.)-কে মক্কায় এবং তায়েফে উসমান ইবনে আবুল আস (রা.)-কে গভর্নর নিযুক্ত করেন, তখন তাঁরাই নামাজে ইমামতি করতেন এবং হুদুদ কায়েম করতেন। একইভাবে রাসূল ﷺ যখন কাউকে কোনো গাজওয়ার আমির নিযুক্ত করতেন—যেমন : জায়েদ ইবনে হারিসা, উসামা ইবনে জায়েদ ও আমর ইবনুল আস (রা.) প্রমুখ সাহাবিকে করেছিলেন—তখন যুদ্ধের আমিরই নামাজ পড়াতেন। এজন্যই আবু বকর (রা.)-কে যেহেতু রাসূল ﷺ নামাজে ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য করেছেন, তাই অপরাপর সকল বিষয়েও তাঁর অগ্রগণ্যতা বা ইমামতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে আবু বকর (রা.)-এর যুগে যারা যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন, তাঁরাই নামাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেমন : ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ, আমর ইবনুল আস (রা.) প্রমুখ সাহাবিগণ।

উমর (রা.)-এর সময়েও কুফার প্রতিনিধিরা নিয়োগ অনুযায়ী কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) যুদ্ধ ও নামাজের দায়িত্বে ছিলেন। ইবনে মাসউদ (রা.) কাজি ও বাইতুলমালের দায়িত্বে ছিলেন। উসমান ইবনে হুনাইফ (রা.) ছিলেন খারাজের পদে।

সেনাপতি, কালেক্টর ও বিচারকের পদের সূচনা

এরপর থেকেই সেনাপতি, কালেক্টর ও বিচারকের পদের সূচনা হয়। কারণ, উমর (রা.)-এর যুগে যখন ইসলামের ভূখণ্ড বিস্তার লাভ করে, তখন বিভিন্ন নতুন নতুন প্রশাসনিক বিভাগ বা দপ্তর খোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন : ভূমিকর অধিদপ্তর, সহায়তা অধিদপ্তর বা দিওয়ানুল আতা। অনেক শহর গড়ে তোলেন। মিশর, বসরা, ফুসতাতের মতো শহর আবাদ হয়।

এমনভাবে শহরগুলো গড়ে তোলা হয়—দজলা, ফোরাত, নীল-এর মতো বিশাল বিশাল নদীও শহর ও সেনাবাহিনীর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারেনি।

মসজিদ ছিল শাসকদের কার্যালয়

মসজিদ ছিল শাসক ও জনগণের সমবেত হওয়ার জায়গা। কেননা, নবিজি মসজিদকে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই তাতে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, শিক্ষা কার্যক্রম ও ওয়াজ-নসিহতের মতো ব্যক্তিগত বিষয় যেমন ছিল, তেমনি সেনাপতি, আমির ও গুপ্তচর নির্ধারণের মতো রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ও সমাধা করা হতো। এ ছাড়াও মুসলিমদের আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ মসজিদে সম্পন্ন হতো। একইভাবে মক্কা, তায়েফ, ইয়ামান ইত্যাদি শহর, সাধারণ জনপদ ও প্রত্যন্ত গ্রামে উমর (রা.)-এর কর্মকর্তাগণ মসজিদে জমায়েত হয়েই রাজনৈতিক কার্যাদি সম্পাদন করতেন। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'বনি ইসরাইলদের শাসন করতেন নবিরা। যখনই কোনো নবি ইন্তেকাল করতেন, তাঁর স্থানে অপর একজন নবি আসতেন। আর আমার পরে যেহেতু আর কোনো নবি নেই, তাই আমার পরে খলিফাগণ শাসক হবেন। যাদের কাউকে তোমরা গ্রহণ করবে এবং বর্জন করবে।' সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'সে অবস্থায় আপনি আমাদের কী আদেশ করবেন?' রাসূল ﷺ বললেন—'তোমরা যে আগে বাইয়াত নেবে, তাঁর হাতেই বাইয়াত গ্রহণ করবে। আর আল্লাহর কাছে তোমাদের হিতকামী শাসকের জন্য দুআ করবে। কারণ, নিশ্চয়ই শাসকগণ অর্পিত দায়িত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবেন।'[৫৯]

খলিফা ও আমিরগণ তাঁদের বাসস্থানেই বসবাস করতেন

অপরাপর মুসলিমদের মতো খলিফা ও আমিরগণও নিজ বাসস্থানেই বসবাস করতেন। তবে তাঁদের মজলিশ বসত জামে মসজিদে।

---

৫৯. প্রাগুক্ত

সাদ (রা.)-এর রাজমহল জ্বালানোর হুকুম দিয়েছিলেন উমর (রা.)

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) কুফাতে একটি রাজমহল নির্মাণ করেন এবং বলেন—'আমি সাধারণ মানুষ থেকে দূরে থাকতে চাই।' উমর (রা.) মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে তাঁর রাজমহল জ্বালানোর ফরমান দিয়ে পাঠালেন। বলে দিলেন, 'সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) যেন নাবতি কাঠের আঁটি কিনে তাঁর মহল পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং মহল জ্বালিয়ে দেন। উমর (রা.) তাঁর শাসক ও জনগণের মাঝে কোনোরূপ অন্তরায় বরদাশত করতেন না। তবুও কয়েকজন আমিরের ব্যক্তিগত প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল!

মুয়াবিয়া (রা.) জনগণ থেকে দূরে থাকতেন

আলি (রা.)-এর ওপর অতর্কিত হামলা হওয়ার পর মুয়াবিয়া (রা.) নিজের ওপর হামলার আশঙ্কা করতেন। তাই মসজিদের এক নিরাপদ প্রকোষ্ঠে তিনি ও তাঁর অমাত্যবর্গ নামাজ আদায় করতেন। বাইরে বের হলে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হতেন। তাঁকে দেখে পরবর্তী রাজতান্ত্রিক খলিফাগণও এই প্রটোকলে উদ্‌বুদ্ধ হন এবং তাঁকে অনুসরণ করেন। তাঁরা জুমা ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে মানুষের সম্মুখে আসতেন এবং নামাজ পড়াতেন। এর বাইরে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া ও হুদুদ কায়েমের সময় তাঁরা জনসম্মুখে আসতেন। এ ছাড়া বাকি সময় তাঁরা মহলে বাস করতেন এবং জনসাধারণ থেকে দূরে থাকতেন। এমনই একটি মহল হলো বনু উমাইয়ার 'আল খাদ্‌রা' প্রাসাদ—যা জামে মসজিদের সামনে অবস্থিত ছিল।

রাজা ও আমিরদের কেল্লা ও দুর্গ নির্মাণ

সময় যতই অতিবাহিত হতে লাগল, মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভক্তি ততই বাড়তে থাকল। প্রতিটি সম্প্রদায় ইসলামের সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরল এবং তাতে নিজেদের মনমতো বাড়াবাড়ি করে অপর সম্প্রদায় থেকে বিমুখ হয়ে গেল। ভুলে গেল ইসলামের ব্যাপকতা ও উদারতার কথা। আমির ও শাসকগণ কেল্লা ও দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করলেন। ইতঃপূর্বেও কেল্লা ও দুর্গ নির্মিত হয়েছে, তবে দেশের সীমানাগুলোতে; যেন শত্রুর হামলা থেকে দেশকে রক্ষা করা যায়।

কেননা, সে যুগে সীমান্তরক্ষী বাহিনী তখনও তৈরি হয়নি। তখন শাম অঞ্চলের সীমান্তকে বলা হতো 'আল আওয়াসিম' অর্থাৎ কিন্নাসরিন ও হালাব (আলেপ্পো)।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, খানকাহ ও আস্তাবল নির্মাণ

বিদ্যোৎসাহীদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইবাদতকারীদের জন্য খানকাহ এবং তাদের বাহনের জন্য ঘোড়াশাল তৈরি করা হয়। সম্ভবত এর ব্যাপক প্রসার শুরু হয় সেলজুক আমলে। প্রথম দিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরাইখানা নির্মাণ করা হয় গরিবদের জন্য। নিজামুল মুলকের সময়ে এসব সরাইখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উপযুক্ত গরিবদের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং ওয়াকফকৃত সম্পদ থেকে এর ব্যয় নির্বাহ করা হতো। এর আগে সরাইখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া গেলেও আমার মনে হয় না তা ওয়াকফ ছিল। তবে বিশেষ কিছু স্থাপনা ছিল।

ইমাম ওয়াহিদি (রহ.)-এর ছাত্র ইমাম মামার ইবনে জিয়াদ *আখবারুস সুফিয়াহ* গ্রন্থে বলেন—'সুফিদের জন্য প্রথম ঘর নির্মাণ করা হয় বসরায়।' তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উল্লেখ সেলজুক আমলের পূর্বেও পাওয়া যায়; হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। আর সেলজুক আমলের সময়কাল হচ্ছে হিজরি পঞ্চম শতাব্দী। অনুরূপভাবে শামের বেশিরভাগ কেল্লা ও দুর্গই নবনির্মিত। যেমনিভাবে আল আদিল দামেশক, বসরা ও হারানে কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন। কারণ, খ্রিষ্টানরা তাদের ওপর ক্রমাগতভাবে আক্রমণ করত। তৃতীয় শতকের পর মুসলিমরা সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে খ্রিষ্টানদের প্রতিহত করতে অক্ষম হতে শুরু করে। একপর্যায়ে তারা শামের তীরবর্তী সীমান্তগুলো দখল করে নেয়।

খিলাফতসংক্রান্ত কিছু ভ্রান্ত আকিদা

কুরআনে খলিফা শব্দের প্রয়োগ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً-

‘স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন— নিশ্চয়ই আমি জমিনে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করব।’ সূরা বাকারা : ৩০

আল্লাহ আরও বলেন—

يَا دَاوُوْدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

‘হে দাউদ! আমি তোমাকে জমিনে আমার প্রতিনিধি বানাব। অতএব, মানুষের মাঝে হকভাবে বিচার করো আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তা না হলে সে (প্রবৃত্তি) তোমাকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে।’ সূরা সোয়াদ : ২৬

‘আমি জমিনে প্রতিনিধি প্রেরণ করব’ কথাটি দ্বারা আদম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের বোঝানো হয়েছে। তবে নাম নিয়েছেন শুধু আদম (আ.)-এর। (আবার কখনো কখনো তাঁর বংশধর বোঝাতে ‘মানুষ’ শব্দ ব্যবহার করে আদম (আ.)-কেও বক্তব্যের মধ্যে শামিল করা হয়েছে।) যেমন : আল্লাহ বলেন—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

‘নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।’
সূরা ত্বিন : ৪

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ - وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ -

‘মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে, যা পোড়ামাটির মতো। আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াহীন অগ্নি থেকে।’ সূরা আর-রাহমান : ১৪, ১৫

الَّذِیْ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَه وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ - ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَه مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ -

‘কাদা হতে তিনি মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। তারপর তিনি তাঁর বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।’
সূরা আস-সাজদা : ৭-৮

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ -

‘তারপর তাকে নুতফারূপে স্থাপন করেছি নিরাপদ স্থানে।’
সূরা মুমিনুন : ১৩

হাদিসে খলিফা শব্দের প্রয়োগ

খলিফা অর্থ হলো—যে অপরের স্থলাভিষিক্ত হয় বা যে পেছনে রয়ে যায়। যেমন : রাসূল ﷺ বলতেন—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِيْ اَهْلِيْ -

‘হে আল্লাহ! আপনি আমার সফরের সঙ্গী। আমি চলে যাওয়ার পর আপনিই আমার পরিবারের নিরাপত্তার “খলিফা”।’[৬০]

৬০. মুসলিম : ১৩৪২

জায়েদ ইবনে খালিদ জুহানি (রহ.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِيْ اَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا-

'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো মুজাহিদকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করে দিলো, সেও জিহাদ করল। যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবারবর্গের দেখাশোনার জন্য তার স্থলাভিষিক্ত হলো, সেও জিহাদ করল। (অর্থাৎ সেও জিহাদকারীর সমান সওয়াব লাভ করবে)।'[৬১]

اَوَ كُلَّمَا خَرَجْنَا فِي الْغَزْوِ خَلَفَ اَحَدُهُمْ وَلَهُ نَبِيْبٌ كَنَبِيْبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ اِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ مِنَ اللَّبَنِ لَئِنْ اَظْفَرَنِيَ اللهُ بِاَحَدٍ مِنْهُمْ لَاَجْعَلَنَّهُ نَكَالًا-

'আমরা যখন জিহাদে বের হই, তাদের কেউ পেছনে রয়ে যায় এবং ছাগলের মতো আওয়াজ করে (অর্থাৎ প্রচণ্ড যৌনাকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়) এবং মুমিনপত্নীদের অল্প দুধ প্রদান করে (অর্থাৎ ব্যভিচার করে)। আল্লাহ যদি তাদের কাউকে পাকড়াও করার ক্ষমতা আমাকে দান করে, তাহলে তাদের এমন শাস্তি দেবো—যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

একইভাবে কুরআনেও এই শব্দমূল দ্বারা 'পেছনে রয়ে যাওয়া' বোঝানো হয়েছে। যেমন—

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ-

'অচিরেই বেদুইনদের যারা পেছনে রয়ে যাবে তারা বলবে...' সূরা ফাতহ : ১১

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُوْلِ اللهِ وَكَرِهُوْا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ-

---

[৬১]. মুসলিম : ১৬৯২

'যাদের পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তারা আল্লাহর রাসূলের সাথে সহযোগিতা না করার ও ঘরে বসে থাকার জন্য আনন্দিত হলো এবং তারা নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অপছন্দ করল।' সূরা আত-তাওবা : ৮১

খলিফা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে তার পূর্ববর্তীর স্থানে রয়ে গেছে। যেমন : রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর আবু বকর (রা.) উম্মতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ হজ, উমরাহ কিংবা যুদ্ধের জন্য সফরে বের হলে তাঁর স্থানে আরেকজনকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রেখে যেতেন। এভাবে তিনি কখনো ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে খলিফা বানিয়েছেন, কখনো-বা অন্য কাউকে। তাবুকের যুদ্ধে খলিফা বানিয়েছিলেন আলি (রা.)-কে।

ইবনে আরাবি (রহ.)-এর একটি ভুল ধারণা

ইবনে আরাবি (রহ.)-এর মতো কতিপয় লোক ধারণা করেছেন, খলিফা আল্লাহর প্রতিনিধি বা আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত। তাঁরা মনে করেন যে, আল্লাহর খলিফা হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইনসান আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত। তাঁরা প্রায়শই আদম (আ.)-কে সকল নাম শিক্ষাদানের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—'সকল নামের অর্থ মানুষের মধ্যে একত্রিত হয়েছে।' পাশাপাশি তাঁরা 'আদম (আ.)-কে আল্লাহর অবয়বে সৃষ্টি করা হয়েছে'—হাদিসটিকেও একইভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। কখনো তাঁরা দার্শনিকদের কথাকে নকল করে বলেন—'মানুষ একটি ছোটো দুনিয়া।' এটা মূলত আগের বক্তব্যটিরই প্রতিফলন। শুধু তা-ই নয়; এর সাথে তাঁরা আরও যোগ করে বলেন—'আল্লাহ হলো একটি বড়ো জগৎ।' মূলত তাঁদের বক্তব্যের মূল ভিত্তি হলো তাঁদের 'ওয়াহদাতুল ওজুদ'-এর কুফরি আকিদা। এই মতবাদ অনুসারে স্রষ্টা হলেন সৃষ্টির অস্তিত্বের সারবস্তু বা মূল। তাই ইনসান হলো আল্লাহর প্রকাশ্য খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত—যাতে সকল নাম ও গুণের সমাবেশ ঘটেছে। আর এর থেকে তৈরি হয় এমন একটি আকিদা, যা তাঁদের রুবুবিয়্যাত ও ইলাহিয়াতের দাবির প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করে। পরিশেষে তাঁরা ফেরাউনি কারামেতা ফিরকা ও বাতেনি ফিরকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

কখনো কখনো তাঁরা নবুয়তকে অপরাপর স্তরের মতো সাধারণ একটি স্তর সাব্যস্ত করেন এবং নিজেদের এর চেয়ে মহৎ মনে করেন। আল্লাহর রুবুবিয়্যাত, ইলাহিয়্যাত ও একত্ববাদকে স্বীকার এবং নবিদের নবুয়তকে মানা সত্ত্বেও তাঁরা ফেরাউনিয়্যাতের অনুসারী। কিংবা তাঁরা মনে করেন, শরিয়তের আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারামের বিধান তাঁদের জন্য প্রযোজ্য নয়।[৬২]

---

[৬২]. এখানে পাঠকদের সুবিধার জন্য কিছু কথা বলে নেওয়া একান্তই জরুরি মনে করি। আবুল হাসান আলি নদভি (রহ.) বলেন, শাইখে আকবর ইবনে আরাবি (৫৫৮-৬৩৮ হি.) (রহ.)-এর কিতাবাদি ও তাঁর ইলম সম্পর্কে যারা গবেষণা করেন, তাঁদের একটি দল মনে করেন—তাঁর কিতাবাদি, বিশেষত *ফুসুসুল হিকাম* ব্যাপক বিকৃতির শিকার হয়েছে। শাইখের ভক্ত ও তাঁর জ্ঞানের ধারক-বাহক দামেশকের শাইখ আহমাদ আল হারুন আল আসাল দৃঢ়তার সাথে বলতেন, *ফুসুসুল হিকামের* এক-তৃতীয়াংশ কিংবা তারও অধিক বানোয়াট ও ভিত্তিহীন তথা মূলপাঠের সাথে সম্পর্কহীন।—(*তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত*-২/৭০। মূল উর্দু কিতাব দ্রষ্টব্য।)

শাইখে আকবর ইবনে আরাবি (রহ.)-এর সবচে' কড়া সমালোচকদের অন্যতম একজন হিসেবে মনে করা হয় ইমামে রাব্বানি মুজাদ্দিদে আলফে সানি (১৫৬৪-১৬২৪ খ্রি. রহ.)-কে। তা সত্ত্বেও তিনি তার মাকতুবাতে বলেন, 'অধম ইবনে আরাবি (রহ.)-কে আল্লাহর মকবুল বান্দা মনে করি। ...লোকেরা তার বিষয়ে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত। তার ভক্ত ও বিদ্বেষীরা কেউ-ই ভারসাম্যতার ধারেকাছে নেই। ...অধম এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী মতকে গ্রহণ করি। ওয়াহদাতুল ওজুদের মন্দকে বাদ দিয়ে ভালোকে গ্রহণ করি। ...মূলত ওয়াহদাতুল ওজুদ হলো আত্মশুদ্ধি চর্চার একটি স্তর। এর পরবর্তী স্তর হলো 'ওয়াহদাতুশ-শুহুদ'।'

(মাকতুবাতে আলফে সানি রহ.-এর বরাতে আবুল হাসান আলি নদভি, তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত : ৪/২৯৪,২৯৫)

ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহ. (১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.) ওয়াহদাতুল ওজুদের সমর্থক ছিলেন। তিনি তার বাবা শাহ আব্দুর রহিম মুহাদ্দিসে দেহলবি (১৬৪৪-১৭১৯ খ্রি) সম্পর্কে *আনফাসুল আরিফিনে* লিখেন, 'আমার বাবা শাইখে আকবর ইমাম মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবি রহ.-কে অনেক শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলতেন, "আমি চাইলে *ফুসুসুল হিকাম*-এর (ইবনে আরাবি রহ.-এর সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থগুলোর অন্যতম) সকল মাসাইলকে কুরআন ও হাদিসের আলোকে বর্ণনা করে প্রমাণ করে দিতে পারি এবং তা এমনভাবে করব, এরপর কারও সন্দেহ বাকি থাকবে না।"' এরপর শাহ সাহেব (রহ.) লিখেন, 'তা সত্ত্বেও আমার বাবা ওয়াহদাতুল ওজুদ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করা থেকে বিরত থাকতেন। কারণ, এই যুগের অধিকাংশ মানুষ ওয়াহদাতুল ওজুদকে বোঝার যোগ্যতা রাখে না।

আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হওয়াটা সম্ভব নয়

আল্লাহর খলিফা (স্থলাভিষিক্ত) হওয়া জায়েজ নেই। তাই লোকেরা যখন আবু বকর (রা.)-কে বলল—'হে আল্লাহর খলিফা!' তখন তিনি বলেছিলেন—'আমি আল্লাহর খলিফা নই; আমি রাসূল্লালাহ ﷺ-এর খলিফা। আমার জন্য এটাই অনেক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এর থেকে পবিত্র।'

খলিফা হলেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রতিনিধি। নবিজি বলেন—

> 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সফরসঙ্গী এবং পরিবারের দেখভালের ক্ষেত্রে আপনি আমাদের প্রতিনিধি।'[৬৩]

আরেকটি হাদিসেও অনুরূপ এসেছে—

> 'হে আল্লাহ! সফরে আমাদের সাথে থাকুন আর পরিবারে আমাদের প্রতিনিধি হোন।'[৬৪]

আর না বোঝার কারণে তারা ইলহাদ (ধর্মহীনতা) ও নাস্তিকতার ফাঁদে পড়ে যায়।' (আনফাসুল আরিফিন, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রহ., ১৮৯ পৃ.)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রহিম (রহ.)-এর চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ইবনে আরাবি রহ.-এর ওয়াহদাতুল ওজুদ ও ইমামে রাব্বানি মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ.-এর 'ওয়াহদাতুশ শুহুদ'-এর মাঝে অপূর্ব সমন্বয় স্থাপন করেন। (আবুল হাসান আলি নদভি, *তারিখে দাওয়া ওয়া আজিমাত ৫/৮৪*)

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) থেকেও ইবনুল আরাবি সম্পর্কে কিছু ইতিবাচক মূল্যায়ন পাওয়া যায়। যেমন : ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 'এদের মধ্যে ইবনে আরাবি ইসলামের সবচেয়ে নিকটবর্তী। তাঁর কথাবার্তা অনেক স্থানেই তুলনামূলক ভালো। আর তা এই জন্য যে, তিনি আদেশ-নিষেধ ও শরিয়তের বিধানাবলিকে যথাস্থানে রেখে চলেন। তাসাউফের শাইখগণ যে আখলাক অবলম্বন করেন এবং যেসব ইবাদত পালনের তাগিদ দিয়েছেন, তিনি তা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। এজন্য অনেক সুফি ও পরহেজগার লোক তাঁর থেকে তাসাওউফের শিক্ষা নিয়ে থাকেন। যদিও তারা তাঁর কথার তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তবে যারা তাঁর কথার সঠিক তাৎপর্য বুঝে তাঁর সাথে একমত হয়, তাদের কাছে তাঁর কথার প্রকৃত মর্ম খুবই পরিষ্কার।' (*জালাউল আইনাইনের* বরাতে আবুল হাসান আলি নদভি, তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত-৪/২৭৮)

[৬৩]. মুসলিম : ১৩৪২

আল্লাহ হলেন চিরঞ্জীব, সর্বদর্শী, ক্ষমতাবান, রক্ষাকর্তা, তত্ত্বাবধানকারী, শাশ্বত, সমগ্র জগৎ থেকে অমুখাপেক্ষী; তাঁর কোনো শরিক নেই, সহযোগী নেই। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কিয়ামতের দিন সুপারিশ করতে পারবে না। আর খলিফা তো তখনই হয়, যখন খলিফা নিয়োগকারীর মৃত্যু বা অনুপস্থিতির কারণ দেখা দেয় অথবা খলিফার প্রয়োজন তখনই দেখা দেয়, যখন খলিফা নিয়োগকারীর খলিফা বানানোর প্রয়োজন পড়ে। এমনকী তাকে 'খলিফা' বলাও হয় এই কারণে যে, সে যুদ্ধে না গিয়ে বাসস্থানে রয়ে গেছে।

খলিফার এই প্রতিটি গুণই আল্লাহর শানে অনুপস্থিত। তিনি এসব থেকে পবিত্র। কারণ, তিনি চিরঞ্জীব, শাশ্বত ও সর্বদর্শী। তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি অনুপস্থিতও হন না। তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি রিজিক দেন, রিজিক গ্রহণ করেন না। তিনি তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেন। পথ দেখান। সুস্থতা দান করেন তাঁর সৃষ্ট উপকরণের মাধ্যমে। তিনিই হলেন প্রশংসিত, অমুখাপেক্ষী। আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, সবকিছুর মালিক তিনি।

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ-

'তিনি আসমানেও ইলাহ, জমিনেও ইলাহ।' সূরা জুখরুফ : ৮৪

আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ কেউ নেই। তাই যে লোক তাঁর স্থলাভিষিক্ত কাউকে বানাবে, সে মুশরিক।[৬৫]

---

[৬৪]. সুনানে তিরমিজি : ৩৪৪৭

[৬৫]. 'স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেন, আমি জমিনে খলিফা বানাব (সূরা বাকারা : ৩০)।' ইমাম তাবারি (রহ.) এই আয়াতে 'খলিফা' শব্দের ব্যাখ্যায় ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন—'এর অর্থ হলো, দুনিয়াতে আল্লাহর পক্ষ হয়ে আল্লাহর হুকুম কায়েম করা।' কুরআন শরিফের আরেকটি আয়াতেও এই ব্যাখ্যাটির সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন—'হে দাউদ! আমি তোমাকে খলিফা বানিয়েছি। সুতরাং মানুষের মাঝে হকভাবে বিচার করো এবং প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ো না।' সূরা সোয়াদ : ২৬ মোটকথা, 'আল্লাহর খলিফা হওয়া'-বিষয়ক যে মতটি ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এখানে

ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর ছায়া শাসক

এখানে একটি প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। হাদিসে এসেছে—

> 'সুলতান হলেন জমিনে আল্লাহর ছায়া; যেখানে আশ্রয় নেয় দুর্বল ও দুস্থ লোকেরা।'[৬৬]

ছায়া তো আশ্রয়প্রার্থীর মুখাপেক্ষী, সঙ্গী ও একপ্রকার অনুগামীও বটে। আর আশ্রয়প্রার্থীও ছায়ার মুখাপেক্ষী। ছায়া তাকে ঘিরে থাকায় সেও ছায়ার সঙ্গী।[৬৭] সুলতান আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। এক মুহূর্তের জন্যও সে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করতে পারবে না। আল্লাহর কাছেই যাবতীয় ক্ষমতা, শক্তি, রক্ষণাবেক্ষণ, সাহায্য ইত্যাদি বিষয়ের মর্যাদা ও নিরপেক্ষ গুণ রয়েছে—যার ওপর ভিত্তি করে সমগ্র সৃষ্টি দণ্ডায়মান এবং আল্লাহর ছায়ার সাদৃশ্য লাভ করেছে। আল্লাহর সৃষ্টি ও বান্দাদের জীবনকে সংশোধিত করার সবচেয়ে মজবুত মাধ্যম হচ্ছে শাসক। ক্ষমতাসীন শাসক যদি দুরস্ত হয়ে যায়, তাহলে জনগণের অবস্থাও দুরস্ত হয়ে যাবে। আর সে নষ্ট হলে তার কারণে এবং তার বিপথগামিতা অনুসরণ করে জনগণও নষ্ট ও বিপথগামী হবে।

তবে সে পুরোপুরি নষ্ট হতে পারবে না। তার মধ্যে কিছুটা কল্যাণের নিদর্শন অবশিষ্ট থাকা আবশ্যক। কারণ, সে আল্লাহর ছায়া। ছায়া কখনো সম্পূর্ণ রোদমুক্ত করে (কষ্ট লাঘব করে) আবার কখনো আংশিক কষ্ট লাঘব করে। আর যদি স্বয়ং ছায়াটিই না থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাই ধসে পড়বে। রাষ্ট্রের কাঠামোই অবশিষ্ট থাকবে না। অনেকটা রুবুবিয়্যাতের গূঢ়তত্ত্ব হারিয়ে যাওয়ার মতো, যার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব।

উল্লেখ করেছেন, তার বিপরীত ভিন্ন একটি মতামতও সালাফ থেকে বর্ণিত আছে। তবে যে অর্থ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) করেছেন, সেই অর্থে মানুষ আল্লাহর খলিফা হতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে যেই অর্থে মানুষকে তাঁর খলিফা বলেছেন, সেই অর্থে মানুষ অবশ্যই আল্লাহর খলিফা—অনুবাদক

৬৬. বাজ্জার : ৫৩৮৩, কানজুল উম্মাল : ৬/৪-৫ (হাদিসটি সহিহ)

৬৭. ছায়া তখনই গুরুত্বপূর্ণ হবে, যখন তার কাছে আশ্রয় নেওয়ার কেউ থাকবে। তাই ছায়া ছায়াগ্রহীতার মুখাপক্ষী।—অনুবাদক

আবু বকর (রা.)-এর খলিফা হওয়ার প্রমাণ

আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত কি মুসলিমদের মনোনয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, নাকি রাসূল ﷺ-এর কোনো প্রচ্ছন্ন কিংবা অপ্রচ্ছন্ন হাদিস দ্বারা হয়েছিল? এ বিষয়ে ইমাম কাজি আবু ইয়ালাসহ আমাদের হাম্বলি মাজহাবের অন্যান্য ইমামগণ আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) থেকে দুটি মত বর্ণনা করেছেন—

১. 'আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিমদের মনোনয়নের ভিত্তিতে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম, ফুকাহা ও হাদিস বিশারদগণ এমনটিই মনে করেন; এমনকী মুতাজিলা ও আশআরিদের মতো কিছু মুতাকাল্লিমিনও এই মত পোষণ করেন।

২. আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাসূল ﷺ-এর ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্যের ভিত্তিতে। এ বক্তব্যের পক্ষে মত দিয়েছেন হাদিস বিশারদদের কয়েকটি দল এবং কতিপয় মুতাকাল্লিমিন। হাসান বসরি (রহ.) থেকেও এমন একটি মতামত পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ-এর বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে যারা মনে করেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন—প্রত্যক্ষ বক্তব্য দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ স্পষ্ট বক্তব্যের ভিত্তিতেই আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত প্রমাণিত হয়েছে।'

খিলাফত নিয়ে কতিপয় গোষ্ঠীর ভ্রান্ত আকিদা

ইমমিয়ারা বলে—অপ্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা আলি (রা.)-এর খিলাফত প্রমাণিত। জাইদিয়্যা, জারুদিয়া ফেরকার লোকেরা মনে করে, এটা আলি (রা.)-এর ব্যাপারে ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত। আর রাওয়ান্দিয়ারা মনে করে, আব্বাস (রা.)-এর খিলাফত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

মূলত ইসলামের বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞজনদের কাছে এ জাতীয় বক্তব্যগুলোর অসারতা সুস্পষ্ট। এসব মতকে যারা বিশ্বাস করে—তারা হয়তো মূর্খ, নয়তো জালিম। এসব যারা বিশ্বাস করে, তাদের অধিকাংশই জিন্দিক।

আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক মূল্যায়নটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর কথাকেই পোক্ত করে। বাস্তব কথা হলো—

> 'আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠা হয়েছে সাহাবিদের মনোনয়ন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণের মাধ্যমে। রাসূল ﷺ তাঁর খিলাফত সম্পর্কে প্রশংসা ও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর আনুগত্যের এবং শাসনভার তাঁর ওপর ন্যস্ত করার আদেশ দিয়েছেন। রাসূল ﷺ উম্মতকে আবু বকর (রা.)-এর হাতে বাইয়াতের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।'

হাদিসে আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের প্রমাণ

মোটকথা রাসূলের বক্তব্যে আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের পক্ষে তিন ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়—

১. সমর্থনমূলক
২. আদেশ বা হুকুমমূলক
৩. দিকনির্দেশনামূলক

সমর্থনমূলক বক্তব্য : যেমন, রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'আমি স্বপ্নে দেখেছি, একটি কাঁচা কুয়া থেকে আমি পানি তুলছি। তারপর ইবনে আবি কুহাফা (আবু বকর রা.) এলো এবং এক বালতি অথবা দুই বালতি ভরপুর পানি তুলল।'[৬৮]

অপর একটি হাদিসে এসেছে, এক সাহাবি বলেন—

> 'আমি স্বপ্নে একটি দাঁড়িপাল্লা আকাশ থেকে নামতে দেখেছি। তারপর তা দিয়ে আপনাকে (রাসূল ﷺ-কে) ও আবু বকরকে পরিমাপ করা হলে আপনার পাল্লা ভারী হয়ে যায়। তারপর আবু বকর ও উমর (রা.)-কে পরিমাপ করা হলে আবু বকর (রা.)-এর পাল্লা ভারী হয়।'[৬৯]

---

[৬৮]. বুখারি : ৩৬৮২, মুসলিম : ২৩৯৩
[৬৯]. আবু দাউদ : ৪৬৩৪, তিরমিজি : ২২৮৭

আরেকটি হাদিস আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> ‘মৃত্যুশয্যায় রাসূল ﷺ আমাকে বলেন—“তোমার বাবা ও ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি একটা ফরমান লিখে দিই—যাতে আমার পর আর কোনো বিবাদ না হয়।” তারপর নবিজি বলেন—“আল্লাহ আবু বকরকে ছাড়া আর কাউকে গ্রহণ করবেন না; এমনকী মুমিনরাও আর কাউকে মানবে না।”’[৭০]

অন্য একটি হাদিসে এসেছে—

> ‘এক সৎ লোক স্বপ্নে দেখেছেন, আবু বকর (রা.) রাসূল ﷺ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।’[৭১]
>
> ‘নবুয়তি খিলাফত ৩০ বছর। তারপর রাজতন্ত্র কায়েম হবে।’

তো এসব হাদিস দ্বারা বুঝে আসে, আল্লাহ আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকে গ্রহণ করেছেন, সমর্থন করেছেন এবং মুমিনরাও তাঁর খিলাফতকে মেনে নেবেন।

আদেশমূলক বক্তব্য : যেমন—

> ‘আমার পরবর্তী দুজন তথা আবু বকর ও উমরকে মান্য করো।’
>
> ‘আমার পর তোমরা আমার সুন্নাহ ও সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহ আঁকড়ে থাকো।’
>
> রাসূল ﷺ-কে একবার এক মহিলা জিজ্ঞেস করল—‘আমরা যদি আপনাকে না পাই, কাকে মেনে চলব?’ রাসূল বললেন—‘তাহলে আবু বকরকে মানো।’[৭২]

---

[৭০]. বুখারি : ৫৬৬৬, মুসলিম : ২৩৮৭

[৭১]. আবু দাউদ : ৪৬৩৬, আহমাদ : ১৪৮২১

[৭২]. বুখারি : ৭৩৬০

নির্দেশনামূলক বক্তব্য : যেমন—

রাসূল ﷺ আবু বকর (রা.)-কে নামাজের ইমামতির অনুমোদন দিয়েছেন। এ ছাড়াও রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'আবু বকরের দরজাটি ছাড়া তোমাদের বাড়ির যেসব দরজা মসজিদের ভেতরমুখী রয়েছে, তা বন্ধ করে দাও।'[৭৩]

এসব ছাড়াও তাঁর আরও বহু গুণ, বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

কুরআনে আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের প্রমাণ

মূলত রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে এতক্ষণ যেসব প্রমাণ আমরা হাজির করলাম, তার প্রত্যেকটিই কুরআন দ্বারা সমর্থিত। অর্থাৎ অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনেও আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের সপক্ষে তিন ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়।

সমর্থনমূলক বক্তব্য

যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ-

> 'তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তাদেরকে আল্লাহ নিশ্চয়ই খলিফা মনোনীত করবেন।' সূরা নুর : ৫৫

আল্লাহ আরও বলেন—

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِه فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَه-

---

[৭৩]. বুখারি : ৪৬৭

'হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ধর্মত্যাগ করবে, (তাদের স্থলে) নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে প্রতিস্থাপিত করবেন, যারা আল্লাহকে ভালোবাসবেন এবং আল্লাহও তাদের ভালোবাসবেন।'[৭৪] সূরা মায়েদা : ৫৪

وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ-

'অচিরেই আল্লাহ কৃতজ্ঞচিত্তদের প্রতিদান দেবেন।'
সূরা ইমরান : ১৪৪

আদেশমূলক বক্তব্য

আল্লাহ বলেন—

لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُوْلِى بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ-

'পেছনে পড়ে থাকা বেদুইনদের বলো, অচিরেই তোমাদের এমন এক বিপুল শক্তিধর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে যুদ্ধে ডাকা হবে, যাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে।' সূরা ফাতহ : ১৬

নির্দেশনামূলক বক্তব্য

যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى-

'নিশ্চয়ই অধিক পরহেজগার ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে।' সূরা লাইল : ১৭

---

[৭৪]. এই আয়াতে বর্ণিত 'রিদ্দাহ' যেন আবু বকর (রা.)-এর সময়কার ধর্মান্তরণের ফিতনার দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেটাকে আবু বকর (রা.) কঠোর হাতে দমন করেছিলেন। এখানে ধর্মত্যাগীদের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে যার কথা বলা হচ্ছে, তিনি খলিফা আবু বকর (রা.) ও সাহাবিগণ।

'নবি ও সিদ্দিকগণ।'[৭৫] 'আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী'[৭৬] ইত্যাদি আয়াতে আবু বকর (রা.)-এর খলিফা হওয়ার নির্দেশনা রয়েছে।

অতএব, আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল; যদিও তাঁর খিলাফতটি নিছক ইজমা দ্বারাই সাব্যস্ত হতে পারত। যেমন : আল্লাহ যদি কোনো ব্যক্তির বিয়ের অভিভাবক (ওলি) হওয়ার আদেশ দেন অথবা কাউকে বিয়ে করানোর জন্য আদেশ দেন কিংবা এর সাথে আরও অনেক কাজের আদেশ দেন, তাহলে তো সেই আদেশ বাস্তবায়নের স্বার্থে ওলি হওয়ার চুক্তি অথবা বিয়ের চুক্তি বিদ্যমান থাকাটা আবশ্যক। আর কুরআন ও সুন্নাহ এই চুক্তির আদেশকেই প্রমাণিত করেছে এবং তাঁর প্রতি আল্লাহর ভালোবাসাকে সাব্যস্ত করেছে। তাই কুরআন ও সুন্নাহ এটাই বলছে যে, জনসাধারণের ওপর আবু বকর (রা.)-কে মনোনীত করাটা আবশ্যক এবং তাঁরা এ ব্যাপারে আদিষ্ট। কাজেই এই আদেশ পালন না করে কোনো গত্যন্তর নেই। তাঁরা আল্লাহর আদেশকে মান্য করে আবু বকর (রা.)-কে মনোনীত করার মাধ্যমে নিজেদের সর্বোত্তম কাজটি করেছেন এবং নিজেদের মর্যাদাকে বুলন্দ করেছেন।

---

[৭৫]. সূরা নিসা : ৬৯

[৭৬]. সূরা তাওবা : ১০০

সাহাবিদের পারস্পরিক যুদ্ধের ইতিহাস এবং আহলে সুন্নাহর অভিমত

সাহাবিদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাসমূহ

খারেজিরা আলি (রা.) এবং যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাদের সবাইকে কাফির মনে করে। আর রাফেজিরা মনে করে—যারা আলি (রা.)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তারা কাফির। অথচ রাসূল থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদিসে রাসূল তাদের মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং কাফির না বলার আদেশ দিয়েছেন।

আয়িশা (রা.), জুবাইর (রা.) ও তালহা (রা.)-এর যুদ্ধের ব্যাপারে ভ্রান্ত আকিদার অনুসারীদের তিন রকমের মতামত পাওয়া যায়। একদল মনে করে, যুদ্ধকারী উভয়পক্ষের একপক্ষ ফাসিক; সবাই না। এ দলে আছে আমর ইবনে উবাইদ ও তাঁর অনুসারীগণ।

আরেক দল মনে করে—যে দল যুদ্ধ বাধিয়েছে, তারা ফাসিক। তবে কেউ যদি তওবা করে, তাহলে সে ফাসিক হবে না। তারা মনে করে, আয়িশা (রা.), জুবায়ের (রা.) ও তালহা (রা.) তওবা করেছিলেন। এটাই তাঁদের জমহুর তথা আবুল হুজাইল ও তাঁর অনুসারী এবং আবুল হুসাইন প্রমুখের বক্তব্যের সারবস্তু।

আরেকদল মনে করে, জুবায়ের (রা.) ও তালহা (রা.)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াটা ভুল ছিল। তবে শামবাসীদের সাথে যুদ্ধটাকে তাঁরা ভুল সিদ্ধান্ত মনে করে না।

মোটকথা, খারেজি রাফেজি ও মুতাজিলারা মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধকে কুফর ও ফাসিকির কারণ মনে করে।

সাহাবিদের পারস্পরিক লড়াই সম্পর্কে আহলে সুন্নাহর অভিমত

আহলে সুন্নাহর সবাই সাহাবিদের 'আদালত' তথা ন্যায়নিষ্ঠতায় বিশ্বাসী। তবে সাহাবিদের ভেতর কার ইজতিহাদ সঠিক বা ভুল ছিল—এ নিয়ে বিভিন্ন মাজহাবের ইমামের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

প্রথমপক্ষ মনে করে, আলি (রা.)-এর সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। দ্বিতীয়পক্ষ মনে করে, সবার সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। তৃতীয়পক্ষ মনে করে, সবার মত সঠিক নয়; কোনো একটি দলের মত সঠিক। চতুর্থপক্ষ মনে করে, তাঁদের ভেতরকার বিবাদকে মোটেই গ্রহণ করা যাবে না; অর্থাৎ এ বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

এটা সর্বজনবিদিত যে, আলি (রা.) ও তাঁর অনুসারীগণ সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন। যেমনটা আবু সাইদ (রা.)-এর হাদিসে এসেছে—

> 'একদল ইসলাম থেকে একসময় বের হয়ে যাবে। তাদের এমন একটি দল হত্যা করবে, যারা সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী।[৭৭]

এই হাদিসটি মূলত শামবাসীদের সাথে যুদ্ধবিষয়ক। এ ছাড়া আরও বহু হাদিস এটাই প্রমাণ করছে যে, জঙ্গে জামাল মূলত একপ্রকার 'ফিতনা' ছিল। আর ফিতনার সময় যুদ্ধ এড়িয়ে চলাটাই উত্তম। এই মতামতটিই ইমাম আহমদ (রহ.)সহ অধিকাংশ আহলে সুন্নাহর বক্তব্য দ্বারা সমর্থিত। এই ঘটনার পর উম্মতের মধ্যে দিন ও দুনিয়ার বিষয়ে যত বিবাদ হয়েছে, তার মূল হলো—মানুষের কথা ও অসংযত কাজ (মুখ ও হাত)। এখান থেকে প্রতিটি বুদ্ধিমান লোকের শিক্ষা নেওয়া উচিত। ফিতনার সময় যুদ্ধ-সংঘাত এড়িয়ে চলাটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মাজহাব বা আমল।

---

[৭৭]. মুসলিম : ১০৬৪

মুসলিমদের পারস্পরিক লড়াইয়ে নিহত ব্যক্তি কি জান্নাতি

মুসলিমদের দুটি দল যদি একটির ওপর আরেকটি হামলা করে। যাদের ওপর হামলা চালানো হয়, তারা যদি পরাজিত হয় এবং পরাজয়ের পর তাদের হত্যা করা হয়, তাহলে পরাজিত দলটির নিহত লোকদের কি জাহান্নামি বলা যাবে? তারা কি রাসূলের হাদিস '(মুসলিমদের পারস্পরিক লড়াইয়ে) হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যাবে'—এর অন্তর্ভুক্ত হবে? আর পরাজিতদের মধ্যে যারা জীবিত রয়ে যাবে, তারা কি যুদ্ধে নিহত লোকদের মতোই জাহান্নামি হবে?

যদি পরাজিত লোকটি হারাম যুদ্ধ থেকে তওবার নিয়্যাতে পরাজিত হয়, তাহলে তাকে জাহান্নামি বলা যাবে না। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং গুনাহ মাফ করেন। তবে যদি তার পরাজয়টা নিছক অক্ষমতার দরুন হয়; তথা সুযোগ পেলে সে অবশ্যই তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করত, তাহলে অবশ্যই সে জাহান্নামে যাবে। যেমন : রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'যখন দুজন মুসলিম তরবারিসমেত ময়দানে মিলিত হয়, তখন হত্যাকারী ও হত্যাকৃত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামে যাবে।' বলা হলো—'হে রাসূল! হত্যাকারীর বিষয়টা বোধগম্য, তবে হত্যাকৃত বা নিহত ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াটা বোধগম্য নয়।' রাসূল ﷺ বললেন—'নিশ্চয়ই সেও হত্যার ইচ্ছাতেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।'[৭৮]

তাই নিহত ব্যক্তি যেহেতু জাহান্নামে যাবে, সেহেতু পরাজিত লোকটির জাহান্নামে যাওয়াটাও সুস্পষ্ট। কেননা, বিজয়ী-পরাজিত উভয়েরই ইচ্ছা ও কাজ একই ছিল। তা ছাড়া নিহত ব্যক্তিটির ওপর মৃত্যুর যে দুর্বিপাক নেমে এলো, তা পরাজিত ব্যক্তিটিকে ভোগ করতে হয়নি। (কারণ, সে জীবিত ও অক্ষত অবস্থাতেই পরাজয় বরণ করেছে)। তাই এই মৃত্যুর দুর্বিপাক যেহেতু নিহত ব্যক্তিটির পাপ মোচন করতে পারেনি বা তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারেনি, তাহলে সামান্য পরাজয়ের দুর্বিপাক

---

৭৮. বুখারি : ৬৮৭৫

বা গ্লানি তার মুসলিম ভাইকে হত্যায় অবতীর্ণ হওয়ার মতো জঘন্য পাপকে কী করে মোচন করবে? বরং তা কখনোই সম্ভব না। উপরন্তু পরাজিত ব্যক্তিটি যদি এরূপ যুদ্ধে অবিচল থাকে, তাহলে তার পাপ ময়দানে নিহত ব্যক্তিটির অপেক্ষায় নিঃসন্দেহে গুরুতর হবে এবং এ কারণে সে জাহান্নামে যাওয়ার অধিক হকদার। কারণ, যে লোকটি ময়দানে মারা গেল, তার পাপ তো মৃত্যুর সাথেই বন্ধ হয়ে গেল। পক্ষান্তরে অন্য লোকটি তওবা না করে তার এই জঘন্য পাপে অবিচল রইল। এজন্যই ফুকাহাদের একটি দল বলেন—যদি এই সব স্বেচ্ছাচারী পরাজিত ব্যক্তিদের পুনর্বার সংগঠিত হয়ে আক্রমণ করার ক্ষমতা থাকে বা সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। তবে যে পরাজিত ব্যক্তি আঘাতের দরুন দুর্বল হয়ে গেছে, তার কথা ভিন্ন। কারণ, তার পুনরায় হামলা করার শক্তি নেই।

উল্লেখ্য, নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে কথিত আছে—সে জাহান্নামি হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর কারণে হয়তো তার আজাব কমতে পারে। আর পরাজয়ের গ্লানি অপেক্ষা মৃত্যু গুরুতর। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, পরাজিত ব্যক্তিটি যদি তওবা না করে তার ভাইয়ের হত্যায় অবিচল থাকে, তাহলে সে নিহত ব্যক্তিটির চেয়ে জঘন্যতম। তবে সে তওবা করলে অবশ্যই আল্লাহ তার প্রতি দয়া ও মাফ করবেন।

বাগি ও খারেজি কি অভিন্ন

বাগি ও খারেজি কি সমার্থক, নাকি এ দুটোতে পার্থক্য আছে? শরিয়ত কি এই দুই দলের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধান আরোপ করেছে, নাকি একই? আর কেউ যদি দাবি করে—ইমামরা এক্ষেত্রে একমত (ইজমা) যে, এদের বিধান একই; পার্থক্য শুধু নামে। অপরপক্ষে কেউ যদি এর বিরোধিতা করে বলে যে, আলি (রা.) শাম ও নাহরাওয়ানের অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, তাহলে কোনটা সঠিক হবে?

প্রথমত, 'এই দুই দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; স্রেফ নামের পার্থক্য'—কথাটি মোটেও ইমামদের ইজমা (সর্বসম্মতি) দ্বারা সমর্থিত নয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল। মূলত বাগিদের বিষয়ে অনেক গবেষকদের মতো হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি, হাম্বলিসহ অন্যান্য মাজহাবের একদল আলিমও মনে করেন, এই দুই দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাঁরা মনে করেন—

আবু বকর (রা.) জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করেছিলেন, তা ছিল 'বাগিদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ। খারেজিদের বিরুদ্ধে আলি (রা.)-এর যুদ্ধও এই পর্যায়ের। এমনকী তাঁরা মনে করেন, জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনসহ যত যুদ্ধ মুসলিম নামধেয় সম্প্রদায়ের সাথে হয়েছে, সবই ছিল বাগিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এর পাশাপাশি তাঁরা এও বিশ্বাস করেন যে, তালহা (রা.), জুবায়ের (রা.) এবং তাঁদের সমমনা সাহাবিরা সকলেই সত্যের ওপর আছেন। তাঁদের কাউকেই কাফির বা ফাসিক বলা যাবে না। কেননা, তাঁরা সকলেই মুজতাহিদ ছিলেন। আর একজন মুজতাহিদের মতের ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ দুটোরই সম্ভাবনা থাকে। ভুল হলে তা ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাই তাঁরা ব্যাপকভাবে বলে দেন, বাগিরা ফাসিক নন।

কথা হচ্ছে—যখন তাঁরা উভয় দলকে অভিন্ন মনে করেন, তখন অনিবার্যভাবেই খারেজি এবং যেসব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহাবিরা সত্যের ওপর থেকে ইজতিহাদ করে যুদ্ধ করেছেন, উভয়েই এক কাতারে শামিল হয়ে যায়। তাই একদল বাগিদের ফাসিক বলেছেন। তবে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো—সাহাবিগণ সত্যনিষ্ঠ। আদালাত বা বিশ্বাসযোগ্যতায় তাঁরা সর্বজনস্বীকৃত।

জমহুরের মতামত

জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণ খারেজি বাগিদের, জঙ্গে জামাল-জঙ্গে সিফফিনের অংশগ্রহণকারী 'বাগিদের' এবং তারা ব্যতীত অন্য বাগি তথা যাদের ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বাগি বলা হয়, তাদের মাঝে পার্থক্য করে থাকেন। সাহাবিদের এটাই প্রসিদ্ধ মত। জমহুর মুহাদ্দিসিন, ফুকাহা মুতাকাল্লিমিন এবং ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)সহ বহু ইমাম এবং তাঁদের অনুসারীগণও এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন।

খারেজিদের হত্যা করা যাবে কি

সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'একটি দল ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে, যখন মুসলিমদের দুটি দলের মধ্যে অধিক সত্যনিষ্ঠ দলটি তাদের হত্যা করবে।'[৭৯]

---

[৭৯]. মুসলিম : ১০৬৪

এই হাদিসটি তিনটি দলের কথা বলছে। ইসলাম থেকে বের হবে তৃতীয় দলটি। যে দলটি যুদ্ধরত মুসলিম দুটি দল থেকে ভিন্ন আরেকটি দল। সে দুটি দলের একটি হলো মুয়াবিয়া (রা.)-এর এবং অপরটি আলি (রা.)-এর। আর আলি (রা.)-এর দলটিই হলো অধিক সত্যনিষ্ঠ।

খারেজিদের সম্পর্কে আরেকটি হাদিসে এসেছে—

> 'তোমাদের মধ্যে এমন লোক হবে, যারা তোমাদের সাথে নামাজ-রোজা আদায় করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করাকে অপমানজনক মনে করবে। কুরআন তাদের গলা দিয়ে নামবে না। তির যেভাবে ধনুক থেকে বের হয়, ইসলাম থেকে তারা সেভাবে বের হয়ে যাবে। তাদের তোমরা যেখানেই পাবে হত্যা করবে। কেননা, যারা তাদের হত্যা করবে, তারা কিয়ামতের দিন এই হত্যার জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবে।'[৮০]

অন্যত্র এসেছে—

> 'যারা খারেজিদের হত্যা করবে, তারা যদি নবির কৃত প্রতিশ্রুতির কথা জানত, তাহলে তারা এই আমল (হত্যা) থেকে বিরত থাকত না; এ কাজেই নিরত থাকত।'[৮১]

ইমাম মুসলিম (রহ.) খারেজিদের বিষয়ক হাদিস ১০টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারি (রহ.) একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও সুনান ও মুসনাদসমূহেও এই হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সংক্রান্ত হাদিস বহুল বর্ণিত ও বহুল প্রচলিত। সবার কাছেই গ্রহণীয়। তাই খারেজিদের হত্যার ব্যাপারে সাহাবিরা সবাই একমত এবং সাহাবিদের অনুসারী উম্মতের আলিমগণও একমত।

অধিকাংশ সাহাবি জঙ্গে জামালে শরিক হননি

জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে একদল সাহাবি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন বটে, তবে অধিকাংশ প্রবীণ ও বিজ্ঞ সাহাবি কোনো পক্ষেই লড়েননি।

---

[৮০]. বুখারি : ৩৬১১, মুসলিম : ১০৬৬

[৮১]. মুসলিম : ১০৬৬, আবু দাউদ : ৪৭৬৮

তাঁরা রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত বহু হাদিস দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং এ যুদ্ধকে ফিতনা হিসেবে আখ্যা দেন। আর ফিতনার সময় যুদ্ধ পরিহার করার সিদ্ধান্ত নেন।

খারেজিদের হত্যার ব্যাপারে আলি (রা.) উৎসাহী ছিলেন। তাদের হত্যার বিষয়ে হাদিসও বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে সিফফিনের যুদ্ধের সমর্থনে তাঁর পক্ষে কোনো দলিল পাওয়া যায় না। এটা নিছক তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা ইজতিহাদ; বরং তিনি যুদ্ধের বিপক্ষে মতামত দাতাদের কখনো কখনো প্রশংসাও করেছেন।

সহিহ হাদিসে এসেছে, রাসূল ﷺ হাসান (রা.) সম্পর্কে বলেছেন—

> 'নিশ্চয়ই আমার এই বংশধর একজন নেতা। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের দুটি বিরাট জামায়াতের মাঝে সন্ধি করাবেন।'[৮২]

রাসূল ﷺ আলি (রা.)-এর দল ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর দলের মাঝে সন্ধি সম্পাদনের জন্য হাসান (রা.)-এর প্রশংসা করেছেন। আর এটা এ কথাই বোঝাচ্ছে যে, এই দুই দলের মধ্যকার যুদ্ধটি পরিহার করাটাই উত্তম ছিল। এই যুদ্ধটি মোটেই কোনো ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব যুদ্ধ ছিল না।

সুতরাং রাসূল ﷺ খারেজিদের হত্যার আদেশ দিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন—এটা প্রমাণিত। তাই রাসূল ﷺ যে দলকে হত্যা করতে আদেশ ও উৎসাহ দিয়েছেন এবং যে দলের সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছেন, সেই দুই দল কি সমান হতে পারে? সাহাবিদের সিফফিন ও জামালের যুদ্ধ এবং খারেজি গোষ্ঠীর জুল খুওয়াইসারাসহ অন্যান্য ও হারুরিয়া গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে যারা অভিন্ন মনে করে, তারা নিশ্চিত গোমরাহি ও অন্ধকারে নিমজ্জিত আছে। মূলত তারা রাফেজি ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তারা খারেজিদের সাথে সাথে জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদেরও ফাসিক ও কাফির মনে করে। তাই এই সম্প্রদায়ের কুফরির বিষয়ে ইমামদের ভেতরে প্রসিদ্ধ দুটি মতানৈক্য রয়েছে। তবুও সকল সালাফ ও ইমাম সাহাবিদের বিষয়ে স্তুতিজ্ঞাপন

---

[৮২]. বুখারি : ২৭০৪ , আবু দাউদ : ৪৬৬২

এবং তাঁদের মধ্যকার বিবাদিত বিষয়ে নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করেন এবং এই বিষয়ে বিতর্ককে তাঁরা এড়িয়ে চলেন। অতএব, এতদুভয়ের মধ্যে তুলনা নিতান্তই বাতুলতা।

তা ছাড়া রাসূল ﷺ খারেজিদের দ্বারা নিহত হওয়ার পূর্বে তাদের হত্যা করার জন্য মুসলিমদের আদেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে বাগিদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন—

> وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْءَ إِلٰى أَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ-
>
> 'যদি মুমিনদের দুটি দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের মাঝে সন্ধি স্থাপন করো। একটি দল যদি অন্য দলের ওপর বাগাওয়াত (বাড়াবাড়ি) করে ফেলে, তাহলে বাগাওয়াতকারী বা বাগিদের সাথে যুদ্ধ করো; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে দলদ্বয়ের মাঝে সন্ধি স্থাপন করো ইনসাফপূর্ণভাবে। ইনসাফ করো। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।' সূরা হুজুরাত : ৯

এখানে বাগিদের দলকে শুরুতেই হত্যা করতে বলা হয়নি। তাই হত্যা করাটা প্রাথমিক আদিষ্ট বিষয় নয়; বরং তারা যুদ্ধে লিপ্ত হলে প্রথমে তাদের মাঝে সন্ধি কর্তব্য। তারপর একটি দল যদি অবাধ্যাচরণ করে (অর্থাৎ বাগাওয়াত করে), তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। তাই একদল ফুকাহা বলেন—অবাধ্যাচারী বা বাগিদের সাথে শুরুতেই যুদ্ধ কাম্য নয়; বরং তারা যুদ্ধের ইচ্ছা করলে যুদ্ধ করতে হবে।

খারেজিদের সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'খারেজিদের তোমরা যেখানেই পাও, হত্যা করো। তাদের হত্যাকারীদের জন্য আল্লাহর নিকট প্রতিদান রয়েছে।'[৮৩]

---

[৮৩]. বুখারি : ৩৬১১, মুসলিম : ১০৬৬

অন্যত্র বলেন—

> 'আমি যদি তাদের পেতাম, তাহলে আদ জাতির মতো তাদের হত্যা করতাম।'[৮৪]

খারেজি ও জাকাত অস্বীকারকারীরা কি এক

যারা জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তাদের বিষয়টাও অনুরূপ। কেননা, আবু বকর (রা.) ও সাহাবিগণের এক্ষেত্রে প্রাথমিক আমল ছিল তাদের হত্যা করা। আবু বকর (রা.) বলেন—

> 'আল্লাহর কসম! উটের যে রশিটি তারা রাসূলকে দিত, তা যদি আমাকে দিতে অসম্মতি জানায়, তাহলেও তা আদায়ের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামব।'[৮৫]

জাকাতের ওয়াজিব হওয়াকে মান্য করা সত্ত্বেও শুধু জাকাত না দেওয়ার কারণে সাহাবিরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

জাকাত অস্বীকারকারীরা কি কাফির

যারা জাকাত দিতে অসম্মত হয়েছিল, তারা কাফির কি না এবং তাদের সাথে শাসক যুদ্ধ করবেন কি না—এ নিয়ে ফুকাহাদের মধ্যে দুই ধরনের মত রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর দুটি মত পাওয়া যায় এদের তাকফিরের ব্যাপারে। যেমন : খারেজিদের ব্যাপারেও তাঁর দুটি মত রয়েছে।

নিছক অবাধ্যাচারী কাফির নয়

সর্বসম্মতভাবে 'নিছক বাগি' কাফির নয়। কেননা, তারা যুদ্ধে জড়িত ও অবাধ্য হওয়ার পরও কুরআন তাদের 'মুমিন ও পরস্পরে ভাই' বলে উল্লেখ করেছে; তবে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

---

[৮৪]. বুখারি : ৩৩৪৪, মুসলিম : ১০৬৪

[৮৫]. বুখারি : ৬৯২৪

সাহাবিগণ সর্বোত্তম মানুষ এবং তাঁদের গালমন্দ করা গুনাহ

যারা মুয়াবিয়া (রা.)-কে অভিশাপ দেয়, তাদের পরিণাম কী? আর রাসূল ﷺ কি এই হাদিসটি বলেছেন—'যখন দুজন খলিফা যুদ্ধ করে, তখন একজন অভিশপ্ত বিবেচিত হবে?' আর এটাও কি রাসূল বলেছেন— 'আম্মার (রা.)-কে হত্যা করবে একদল বাগি?'

আম্মার (রা.)-কে কি হত্যা করেছে মুয়াবিয়া (রা.)-এর সৈন্যদল? এরা কি নবিপরিবারকে গালি দিত? হাজ্জাজ কি অভিজাত কাউকে হত্যা করেছে?

সাহাবিদের গালমন্দ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ

সাহাবিদের অভিসম্পাতকারী শাস্তির উপযুক্ত। তাঁদের অভিশাপ বা বদদুআ দেওয়া একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেই সাহাবি যে-ই হোক না কেন; চাই তিনি মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সমমর্যাদার হোক কিংবা হোক তাঁদের চেয়েও অধিক মর্যাদার। যেমন : আবু মুসা আশআরি ও আবু হুরায়রা (রা.)-এর সমপর্যায়ের হোক অথবা তাঁদের চেয়েও অধিক মর্যাদার। যেমন : তালহা, জুবায়ের, উসমান, আলি, আবু বকর, উমর, আয়িশা (রা.) প্রমুখ সাহাবিদের সমপর্যায়ের।

মোটকথা যাকেই গালি দিক, গালিদাতা কঠিন শাস্তি পাবে—এটা ইমামদের সর্বসম্মত অভিমত। তবে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে তার শাস্তির ধরন নিয়ে।

তাকে কি হত্যা করা হবে, নাকি হত্যার চেয়ে লঘুদণ্ড দেওয়া হবে? এ ব্যাপারে আমি অন্যত্র সবিস্তার আলোচনা করেছি।

সাহাবিদের গালি দেওয়া হারাম। দলিল হলো আবু সাইদ খুদরি (রা.)-এর হাদিস। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'তোমরা আমার সাহাবিদের গালি দিয়ো না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবুও সে তাঁদের এক মুদ পরিমাণ বা তার অর্ধেক (সাদাকার) পুণ্য অর্জন করতে পারবে না।'[৮৬]

আর অভিশাপ গালির চেয়ে নিকৃষ্টতর। সহিহ হাদিসে এসেছে—

> 'মুমিনকে অভিশাপ দেওয়া তাঁকে হত্যার সমতুল্য।'[৮৭]

রাসূল ﷺ কোনো মুমিনকে অভিশাপ দেওয়াকে হত্যার সমতুল্য গণ্য করেছেন।

মুমিনদের সর্বোত্তম দল সাহাবিদের দল

রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'সর্বোত্তম সহচর হলো—যাদের মাঝে আমি প্রেরিত হয়েছি। এদের পর যারা আসবে, তাঁদের মর্যাদা। এদের পর তাঁরা শ্রেষ্ঠ, যারা এদের পরবর্তী সময়ে আসবে।'[৮৮]

সাহাবিদের ভেতর মুমিন অবস্থায় যে যতটুকু রাসূলকে দেখেছে, সে ততটুকুই রাসূলের সাহচর্য পেয়েছে। যেমনটা সহিহ হাদিসে এসেছে—

> 'একটি দল যুদ্ধ করতে থাকবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে—"তোমাদের ভেতর এমন কেউ কি আছে, যে রাসূলের সান্নিধ্য পেয়েছে? তাঁরা বলবে—"হ্যাঁ।" তাঁরা তখন বিজয়ী হবে। তারপর আরেকটি দল যুদ্ধ করবে। তাঁদের বলা হবে—

---

[৮৬]. বুখারি : ৩৬৭৩, মুসলিম : ২৫৪০

[৮৭]. বুখারি : ৬০৪৭

[৮৮]. বুখারি : ২৬৫১, মুসলিম : ১৭৬

"তোমাদের কেউ কি রাসূল ﷺ-কে দেখেছ?" তাঁরা বলবে—"হ্যাঁ।" তাঁরা তখন বিজয়ী হবে। তারপর তৃতীয় দলটির কথা উল্লেখ করা হলো।'[৮৯]

এই হাদিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি—যে রাসূলের সাহচর্য পেয়েছে আর যে রাসূলকে দেখেছে, তাঁকে একই দলভুক্ত করা হচ্ছে।

রাসূলের সোহবত বা সাহচর্য শব্দ নিয়ে কিছু কথা

রাসূলের সাহচর্যের কিছু স্তরভেদ রয়েছে। যে সাহাবি তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা কৃতিত্বের জন্য অনন্য, তাঁকে সোহবত বা সাহচর্যের সেই বিশেষণেই অভিহিত করা হয়। যেমন : আবু সাইদ (রা.)-এর পূর্বোল্লিখিত হাদিসে আছে, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) যখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর সাথে বিতণ্ডা করছিলেন, তখন রাসূল ﷺ খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে বলেন—

'হে খালিদ! তোমরা আমার সাহাবিদের গালি দিয়ো না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবুও সে তাঁদের এক মুদ পরিমাণ বা তার অর্ধেক পুণ্যও অর্জন করতে পারবে না।'

কারণ, আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ও তাঁর সমপর্যায়ের সাহাবিদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তাঁরা ইসলামের প্রথম দিকের অগ্রবর্তী দল—যারা ইসলামের বিজয় তথা হুদাইবিয়ার বিজয়ের পূর্বে ধন-সম্পদ উৎসর্গ করেছে। আর খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর সমপর্যায়ের সাহাবিরা হুদাইবিয়ার বিজয়ের পরে জান ও মাল উৎসর্গ করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ বলেন—

لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ-

[৮৯]. বুখারি : ২৮৯৭, মুসলিম : ২০৮

'তোমাদের মধ্যকার ওইসব লোক (মর্যাদার দিক থেকে) ভিন্ন, যারা (হুদাইবিয়ার) বিজয়ের পূর্বে সম্পদ উৎসর্গ করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। এরা তাঁদের চেয়ে উত্তম, যারা তাঁদের পরে সম্পদ উৎসর্গ করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন।' সূরা হাদিদ : ১০

আর এখানে বিজয় দ্বারা হুদাইবিয়ার বিজয় উদ্দেশ্য। যখন রাসূল ﷺ গাছের নিচে বাইয়াত নিয়েছেন, তখন চৌদ্দশোর অধিক সাহাবি বাইয়াতবদ্ধ হন। এরা পরবর্তী সময়ে খায়বার জয় করেন। এদের সম্পর্কে নবিজি বলেন—

'যে গাছের নিচে বাইয়াতবদ্ধ হয়েছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।'[৯০]

উল্লেখ্য, সূরা ফাতহে যে বাইয়াতের কথা বলা হয়েছে, তা মক্কা বিজয়ের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে; বরঞ্চ তা রাসূল ﷺ-এর উমরাহেরও আগে হয়েছে। রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের নিকট থেকে বাইয়াত নিয়েছিলেন ষষ্ঠ হিজরিতে একটি গাছের নিচে। সে বছরই মুশরিকদের সাথে সুপ্রসিদ্ধ হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়। এই সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানদের বিশাল বিজয় সাধিত হয়। যে বিজয় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবগত ছিলেন; যদিও অনেক মুসলিম এই সন্ধিকে পছন্দ করেননি। এমনকী এটা তাঁদের জন্য কী শুভ পরিণাম বয়ে আনতে যাচ্ছে, তা আঁচও করতে পারেননি। তাই সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) বলে বসেন—

'হে লোক সকল! তোমাদের বুদ্ধিকে অভিযুক্ত মনে করো। আল্লাহর কসম! আমি আবু জানদালের সে দিনটি দেখেছি। আমার যদি রাসূল ﷺ-এর আদেশ প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য থাকত, তাহলে অবশ্যই তা করতাম।'[৯১]

এর পরের বছর রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ উমরাহ করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করেন। মক্কার অধিবাসীরা তখন মুশরিকদের পক্ষে ছিল। তারপর অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয় হয়। আল্লাহ সূরা ফাতহের আয়াত নাজিল করেন—

---

[৯০]. মুসলিম : ২৪৯৬, ৬২৯৮

[৯১]. বুখারি : ৩১৮১

لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ চাহে তো তোমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদ হয়ে, নিজদের মাথা মুণ্ডন করে, কেশ কর্তিত অবস্থায়, নির্ভয়ে। যেহেতু আল্লাহ তা জানেন, যা তোমরা জানতে পারোনি। এ ছাড়াও তোমাদের জন্য রেখেছেন আসন্ন বিজয়।' সূরা ফাতহ : ২৭

আল্লাহ সূরা ফাতহে মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করবেন। আর সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন দুই বছর পরেই। এ সম্পর্কে আয়াত নাজিল করেন—

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ-

'সম্মানিত মাস সম্মানিত মাসের বিনিময়ে এবং সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় কিসাসভুক্ত।' সূরা বাকারা : ১৯৪

এ সবই মক্কা বিজয়ের পূর্বে। তাই যারা ধারণা করে থাকে যে সূরা ফাতহ মক্কা বিজয়ের পর নাজিল হয়েছে, তারা নিতান্তই ভুল ধারণায় ডুবে আছে। এই দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো—যেসব সাহাবি হুদাইবিয়ার বিজয়ের পূর্বে রাসূলের সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাই তাঁদের পরে যারা সাহচর্য পেয়েছেন, তাঁদের চেয়ে তাঁরা বেশি মর্যাদার দাবিদার। এ কারণেই রাসূল ﷺ খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে বলেছেন, 'তোমরা আমার সাহাবিদের গালি দিয়ো না।' খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) ও তাঁর সমপর্যায়ের সাহাবিরা আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর পরে রাসূলের সান্নিধ্যে এসেছেন।

মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস (রা.) নিফাকমুক্ত

মুয়াবিয়া (রা.) ও আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সমমতের সাহাবিদের সম্পর্কে কোনো সালাফই নিফাক বা মুনাফিক হওয়ার অভিযোগ আরোপ করেননি। সহিহ হাদিসে এসেছে—

> 'আমর ইবনুল আস (রা.) যখন রাসূলের হাতে বাইয়াতবদ্ধ হন, তখন শর্তজুড়ে দেন, "আমার পূর্বের সমস্ত পাপ মাফ হবে তো?" রাসূল ﷺ বলেন—"হে আমর! তুমি কি জানো না, ইসলাম ব্যক্তির পূর্বের সমস্ত কিছু মিটিয়ে দেয়?"'[৯২]

আর এটা সকলেই জানে—যে ইসলাম সবকিছু মিটিয়ে দেয় বা মুছে দেয়, তা মুমিনের ইসলাম। মুনাফিকের ইসলাম গ্রহণ কিছুই মেটাতে পারে না। তা ছাড়া আমর ইবনুল আস (রা.) ও তাঁর সমতুল্য অনেক সাহাবিই হুদাইবিয়ার পরে নিজ দেশ থেকে হিজরত করে রাসূলের কাছে চলে এসেছিলেন সাগ্রহে ও স্বেচ্ছায়; কোনো প্রকার জবরদস্তির শিকার না হয়ে। আর মুহাজিরদের ভেতর কেউ-ই মুনাফিক ছিল না।[৯৩]

কতিপয় মুনাফিক আনসারের মুনাফিকির কারণ

কতিপয় আনসারের ভেতর নিফাক ছিল। এর কারণ হলো—সকল আনসার মদিনাবাসী হওয়ার কারণে মদিনার অভিজাত ও মান্যবর ব্যক্তিগণ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন অন্যরাও কপটতা ও মুনাফিকির আশ্রয় নিয়ে নিজেদের মুসলিম হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন বোধ করে। কারণ, ইসলাম তখন সম্মানের প্রতীক এবং তাদের গোত্রের সবাই তা গ্রহণ করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে মক্কার সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অভিজাত লোকই ছিল কাফির। তাই ইসলামের প্রকাশ ওই ব্যক্তিই করেছে, যে ভেতরে ও বাইরে সমানভাবে মুসলিম ছিল। তখন যে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করত, তাকেই নির্যাতন করা হতো এবং বয়কট করা হতো। অন্যদিকে মদিনার মুনাফিকরা ইসলামের কথা বলত দুনিয়াবি সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য। আর মক্কায় ইসলামের কথা প্রকাশ করলে দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হয়ে যেত। জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত।

---

[৯২]. মুসলিম : ১২১

[৯৩]. আমর ইবনুল আস (রা.) যেমন ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সকল গুনাহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, একইভাবে মুয়াবিয়া (রা.)ও ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন।—অনুবাদক

তারপর রাসূল ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করলেন, তখন তাঁর সাথে অধিকাংশ মুসলিমই হিজরত করলেন। কিছু লোককে হিজরত করতে বাধা দেওয়া হলো। এদের মধ্যে বনি মাখজুমের খালিদ বিন ওয়ালিদ-এর ভাই ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা (রা.)ও ছিলেন (এখানে পিতা ও পুত্রের নাম একই)। রাসূল ﷺ তাঁদের জন্য কুনুত পড়তেন—

> 'হে আল্লাহ! তুমি ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদকে এবং সালামা ইবনে হিশামকে মুক্ত করো। মুদার গোত্রের ওপর তোমার পাকড়াও মজবুত করো...'[৯৪]

তাই মুহাজিরদের ভেতর সবাই নিফাকের অভিযোগমুক্ত। তাঁদের কারও সম্পর্কে কেউ নিফাকের অভিযোগ করেনি; বরং প্রত্যেকেই মুমিন হিসেবে সনদপ্রাপ্ত।

ওহির লিপিকার মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে রাসূলের দুআ

স্বাধীন লোকদের মধ্যে মুয়াবিয়া (রা.)সহ আরও কিছু সাহাবি মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেমন : ইকরামা ইবনে আবু জাহেল, হারিস ইবনে হিশাম, সুহাইল ইবনে আমর, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, আবু সুফিয়ান (রা.) প্রমুখ সাহাবি। তাঁদের ইসলাম সকল মুসলিমদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কলুষমুক্ত। মুয়াবিয়া (রা.)-কে দিয়ে রাসূল ﷺ ওহি অনুলিখন করিয়েছেন এবং তাঁর জন্য দুআ করেছেন—

> 'হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে কুরআনের জ্ঞান ও হিসাববিদ্যার জ্ঞান দান করো এবং তাঁকে আজাব থেকে নাজাত দান করো।'[৯৫]

তাঁর ভাই ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) ছিলেন তাঁর চেয়েও মহত্তম। আবু বকর (রা.) যেসব আমিরকে শাম বিজয়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)। একবার আবু বকর (রা.) পায়ে হেঁটে এবং ইয়াজিদ ইবনে সুফিয়ান আরোহী হয়ে যাচ্ছিলেন। ইয়াজিদ (রা.) আবু বকর (রা.)-কে বলেছিলেন—

---

[৯৪]. বুখারি : ৮০৪

[৯৫]. আহমাদ : ১৭১৫২

'হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! হয়তো আপনি সওয়ারি হন, নয়তো আমি আপনার সাথে হাঁটি।' আবু বকর (রা.) বলেছিলেন—'আমি সওয়ারি হব না, আর তুমিও নামবে না। কারণ, আমি আল্লাহর রাস্তায় আমার পদক্ষেপগুলো গুনছি।'[৯৬]

অপর আমির ছিলেন আমর ইবনুল আস (রা.)। তৃতীয়জন ছিলেন শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ (রা.)। চতুর্থজন ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)। তিনি ছিলেন সাধারণ আমির। পরবর্তী সময়ে উমর (রা.) তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। তাঁর স্থানে নিযুক্ত করেছিলেন আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)-কে, যার সম্পর্কে খোদ রাসূল ﷺ বলেছেন—

'সে হলো এই উম্মতের আস্থার আধার।'[৯৭]

শাম বিজয় হয়েছিল তাঁর হাতেই। আর ইরাক বিজয় হয়েছে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর হাতে।

উমর (রা.) কর্তৃক মুয়াবিয়া (রা.)-কে গভর্নর নিয়োগ

উমর (রা.)-এর শাসনামলে যখন ইয়াজিদ ইবনে সুফিয়ান (রা.) ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর ভাই মুয়াবিয়া (রা.)-কে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। আর এটা সর্বজনবিদিত যে, উমর (রা.) সর্বাপেক্ষা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মানুষ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্য সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি নিবেদিতপ্রাণ। তাই তো আলি (রা.) বলেন—'আমরা পরস্পরে আলোচনা করতাম, "প্রশান্তি" উমর (রা.)-এর ভাষায় কথা বলে।'

রাসূল ﷺ বলেন—

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সত্যকে উমরের মুখে ও অন্তরে স্থাপিত করেছেন।'[৯৮]

---

[৯৬]. মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ১০

[৯৭]. বুখারি : ৭২৫৫

রাসূল ﷺ আরও বলেন—

'আমি যদি তোমাদের মাঝে প্রেরিত না হতাম, তাহলে উমর প্রেরিত হতো।'[৯৯]

ইবনে উমর (রা.) বলেন—'আমি উমর (রা.)-কে কোনো বিষয়ে সন্দেহ ও দ্বিধান্বিত হয়ে কথা বলতে দেখিনি। যা বলতেন, দৃঢ়তার সাথে বলতেন।' রাসূল ﷺ আরও বলেছেন—

'তুমি যে রাস্তায় চলেছ, সে রাস্তায় শয়তানকে চলতে দেখিনি।'[১০০]

আবু বকর ও উমর (রা.) নিজ আত্মীয় ও মুনাফিকদের কখনোই নিয়োগ দেননি

আবু বকর ও উমর (রা.) মুসলিমদের প্রশাসক হিসেবে কখনোই নিজেদের আত্মীয় ও মুনাফিকদের নিয়োগ করেননি। আল্লাহর জন্য তাঁরা কখনোই কোনো নিন্দার তোয়াক্কা করেননি; বরং তাঁরা যখন ধর্মান্তরীদের (মুরতাদ) সাথে যুদ্ধ করছিলেন এবং তাদের ইসলামে ফিরিয়ে এনেছিলেন, তখন তাদের পশুর ওপর সওয়ার হয়ে অস্ত্র বহন করতে নিষেধ করেছিলেন, যেন তাদের তওবা সঠিকভাবে হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। উমর (রা.) সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে ইরাকের প্রশাসক থাকাকালে বলেছিলেন, 'ধর্মান্তরীদের কাউকে কোনো প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দেবে না। তাদের সাথে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করবে না।'

সুতরাং এই আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত যে, উমর (রা.) ও আবু বকর (রা.) যখন কারও থেকে কোনো রকম নিফাকির আশঙ্কা বোধ করেছেন, তাকে আর প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত করেননি।

---

[৯৮]. তিরমিজি : ৩৬৮২

[৯৯]. ভিন্ন শব্দে তিরমিজিতে এসেছে : ৩৬৮৬

[১০০]. বুখারি : ৩৬৮৩

আবু সুফিয়ান ও আমর ইবনুল আস (রা.)-কে আমির নিযুক্তি

আমর ইবনুল আস (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) প্রমুখ সাহাবিদের থেকে যদি নিফাকির বা মুনাফিকির আশঙ্কা থাকত, তাহলে তাঁদের কখনোই মুসলিমদের শাসক বানানো হতো না। রাসূল ﷺ আমর ইবনুল আস (রা.)-কে গাজওয়ায়ে জাতুস-সালাসিলে আমির নিযুক্ত করেছিলেন। আর নবি কখনোই একজন মুনাফিককে আমির বানাতে পারেন না। রাসূল ﷺ মুয়াবিয়া (রা.)-এর পিতা আবু সুফিয়ান (রা.)-কেও নাজরানের শাসক বানিয়েছিলেন। রাসূলের মৃত্যু পর্যন্ত আবু সুফিয়ান (রা.) নাজরানে রাসূলের প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আর সকল মুসলিমই একমত যে, মুয়াবিয়া (রা.)-এর ইসলাম ছিল তাঁর বাবার ইসলামের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতর।

তাই তাঁরা যদি মুনাফিক হতেন, তাহলে রাসূল ﷺ কী করে তাঁদের ওপর মুসলমানদের ইলম ও আমলের দায়িত্বভার আরোপ করতেন কিংবা তাঁদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে নিরাপদ থাকতেন?

হাদিস বর্ণনায় মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস (রা.)-এর গ্রহণযোগ্যতা

এটা সকলেই জানে যে, মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস (রা.) প্রমুখ সাহাবিদের মাঝে ফিতনার দরুন অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। তদুপরি তাঁদের পক্ষের, বিপক্ষের কিংবা নিরেপক্ষ কেউ-ই তাঁদের বিরুদ্ধে রাসূলের নামে মিথ্যাচারের অভিযোগ দেননি; বরং সাহাবি ও তাবেয়িদের মধ্য হতে সকল আলিম এক্ষেত্রে একমত যে, তাঁরা সকলেই রাসূলের কথা সত্য সত্যই মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আস্থা ও বিশ্বস্ততার সাথে রাসূলের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে রাসূলের হাদিসের ব্যাপারে মুনাফিকের ওপর আস্থা রাখা যায় না; বরং সে রাসূলের নামে মিথ্যাচার করে বেড়ায় এবং রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে।

মুয়াবিয়া (রা.) ও অন্যান্য সাহাবিদের অভিশাপকারীর পরিণাম

সাহাবিগণ যেহেতু মুমিন ছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসায় মত্ত ছিলেন, তাই যে ব্যক্তি তাঁদের অভিশাপ দেবে, সে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যাচরণ করবে। বুখারিতে এসেছে—

'এক ব্যক্তির ডাকনাম ছিল গাধা। সে মদ পান করত। ফলে তাকে বারবার রাসূলের কাছে হাজির করা হতো দোররা মারার জন্য। একবার তাকে নিয়ে আসা হলে এক লোক বলল—"আল্লাহ তার ওপর অভিশাপ দিক! আর কত বার একে শাস্তি দিতে হবে?" রাসূল বললেন—"তোমরা তাকে অভিশাপ দিয়ো না। কেননা, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।"'[১০১]

প্রত্যেক মুমিনই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে না, সে মুমিন নয়। ঈমান ও ঈমানের গভীরতা সাপেক্ষে মুমিনদের বহু স্তরভেদ থাকা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ মদ পানকারীকে লানত করতে নিষেধ করেছেন। যদিও তিনি মদ তৈরিকারী, মদের ফরমায়েশকারী, মদ পানকারী, মদ বহনকারী, যার জন্য মদ বহন করা হয়, মদ পরিবেশনকারী, মদ বিক্রয়কারী, এর মূল্য ভোগকারী, মদ ক্রেতা এবং যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়[১০২]—এদের সবাইকে অভিশপ্ত ঘোষণা করেছেন, তবুও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লানত করতে নিষেধ করেছেন।

কেননা, অভিশাপ একপ্রকার সতর্ককরণ কিংবা ভীতিপ্রদর্শন—যা প্রায়শই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই নির্দিষ্ট ব্যক্তিটি খাঁটি তওবার মাধ্যমে এই সতর্কীকরণ কিংবা শাস্তির প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে পারে। আবার গুনাহ মোচনকারী নেক কাজের মাধ্যমে, বিপদাপদের মাধ্যমে কিংবা মকবুল শাফায়াত—যা শাস্তি থেকে বান্দাকে মুক্তি দিতে পারে ইত্যাদির মাধ্যমেও সে মুক্তি পেতে পারে।

নেক কাজের মাধ্যমে সাহাবিদের বড়ো ভুলগুলোও আল্লাহ ক্ষমা করেন

হাতিব ইবনে আবি বালতায়া (রা.) তাঁর দাসদের সাথে রূঢ় আচরণ করত। সহিহ হাদিসে এসেছে—

---

[১০১]. বুখারি : ৬৭৮০

[১০২]. তিরমিজি : ১২৯৫

'তাঁর এক দাস তাঁর সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর কাছে বললেন—"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই হাতিব ইবনে আবি বালতায়া জাহান্নামে যাবে।" রাসূল বললেন—"তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, সে বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে।"'[১০৩]

সহিহ হাদিসে এসেছে—

'রাসূল ﷺ আলি ও জুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.)-কে বললেন—'তোমরা দুজন রওজাতু খাখে যাও, সেখানে একজন দাসীকে পাবে। তার কাছে একটি চিঠি আছে।" আলি (রা.) বলেন—"আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে রওয়ানা হলাম। একসময় সেই দাসীর দেখা পেয়ে বললাম—"চিঠি কোথায়?" সে বলল—"আমার কাছে কোনো চিঠি নেই।" আমরা তাকে বললাম—"তুমি চিঠি বের করবে, নাকি আমরা তোমার কাপড় খুলে বের করব?"

আলি (রা.) বলেন—"তারপর সে তার চুলের খোঁপা থেকে চিঠিটি বের করে দিলো। আমরা সেটা নিয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে এলাম। চিঠিটা ছিল হাতিব ইবনে বালতায়ার। সে তাতে মক্কার মুশরিকদের কাছে রাসূলের বিভিন্ন গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য পাচার করছিল।" রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন—"এটা কী হাতিব?" তিনি বললেন—"আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আমি মুরতাদ হয়ে এটা করিনি। ইসলাম ছেড়ে কুফরির প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও করিনি। আমি কুরাইশ বংশোদ্ভূত নই। তাদের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে বটে। আর আপনার সাথে যেসব মুহাজির সাহাবি রয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকেই কুরাইশের সাথে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। তাঁদের পরিবার মক্কাতে নিরাপদে থাকবে। তাই আমার যখন এই

---

[১০৩]. মুসলিম : ২৪৯৫

সুবিধাটি নেই, আমি চাইলাম তাদের একটু সহযোগিতা করতে, যেন তারা আমার পরিবারকে হেফাজত করে।"'[১০৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, হাতিব ইবনে আবি বালতায়া (রা.) তারপর বলেছিলেন—

'আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, এটা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাহায্য করবেন।' এ কথা শুনে উমর (রা.) বলেন—'অনুমতি দিন! এই মুনাফিকের গরদান উড়িয়ে দিই।' রাসূল ﷺ বলেন—'সে বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তুমি কি জানো না, বদরে অংশগ্রহণকারীদের বিষয়ে আল্লাহ অবগত রয়েছেন? তিনি বলেছেন—"জেনো রাখো! তোমরা যা-ই করো, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।"'[১০৫]

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, বদরে অংশ নেওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা এই মহাগর্হিত কাজটিও ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এই হাদিসটি দ্বারা বোঝা গেল, বড়ো কোনো ভালো কাজের দ্বারা আল্লাহ বড়ো খারাপ কাজকে মিটিয়ে দেন, মাফ করে দেন। আর মুমিনগণ প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণীতে বিশ্বাস করে। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন—'যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে যাবে।'[১০৬]

যদিও পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা এটাও বলেছেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا-

'নিশ্চয়ই যারা ইয়াতিমদের সম্পদ জুলুম করে কুক্ষিগত করে নেয়, তারা তো কেবল আগুনই উদরস্থ করে। অচিরেই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' সূরা নিসা : ১০

---

[১০৪]. বুখারি : ৩০০৮, মুসলিম : ১৬১

[১০৫]. বাজ্জার : ২৬৯৫, মাজমাউজ জাওয়াইদ : ৯/৩০৪

[১০৬]. আবু দাউদ : ৩১১৬

অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে জাহান্নামি কিংবা জান্নাতি না বলা

সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট কাউকে জাহান্নামি অথবা জান্নাতি বলা যাবে না।

> 'যে অণু পরিমাণ কল্যাণ করবে, তা সে দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ অকল্যাণ করবে, তাও সে দেখতে পাবে।'

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাপকতার ওপর ভর করে বলা যাবে না যে, গুনাহকারী শাস্তি পাবেই। কোনো বান্দার আমলনামায় যখন গুনাহ ও নেকি একসঙ্গে জমা হয়, তখন সে গুনাহর কারণে শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হলেও পুণ্যের বিনিময় পাবেই। মুমিনের সওয়াব তার গুনাহর কারণে নষ্ট হবে না। এটা খারেজি ও মুতাজিলাদের বিশ্বাস যে, কবিরা গুনাহর কারণে বান্দার সকল সওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে এবং কবিরা গুনাহকারীগণ অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। তারা কারও শাফায়াতের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না। কবিরা গুনাহকারীর ঈমান থাকবে না। এই সব ভ্রান্ত মতামত। কুরআন ও হাদিসে মুতাওয়াতিরের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। ইজমায়ে সাহাবি তথা সাহাবিদের সর্বসম্মতিক্রমে এই মতামত ভ্রান্ত।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের দৃষ্টিতে ব্যক্তির নিষ্পাপতা

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের সকল ইমাম একমত যে, কোনো সাহাবি কিংবা আল্লাহর নৈকট্যধন্য ও ইসলামে অগ্রবর্তী কোনো ব্যক্তি—কেউ-ই নিষ্পাপ নয়; বরং তাঁরা মনে করেন, এসব লোকেরাও পাপ করে ফেলতে পারেন। আল্লাহ তাঁদের তওবার বিনিময়ে ক্ষমা করে দেবেন। তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। গুনাহ মোচনকারী নেক কাজের ওসিলায় আল্লাহর তাঁদের গুনাহ মাফ করবেন।

আল্লাহ বলেন—

وَالَّذِىْ جَاۤءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ- لَهُمْ مَا
يَشَاۤءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْمُحْسِنِيْنَ- لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ
اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্যায়ন করেছে, তারাই মুত্তাকি। তারা যা চাইবে, আল্লাহর তরফ থেকে তা-ই তাদের জন্য রয়েছে। এটা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান—যাতে করে তাদের কৃত মন্দ কাজ আল্লাহ মাফ করে দেন এবং তারা যে উত্তম কাজ করত, তার প্রতিদান দেন।' সূরা জুমার : ৩৩-৩৫

আল্লাহ অন্যত্র বলেন—

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

'যখন পরিণত বয়সে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে—"হে আমার রব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য এবং যাতে আমি এমন সৎ কাজ করতে পারি—যা আপনি পছন্দ করেন। আর আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদের সংশোধন করে দিন। নিশ্চয় আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।"' সূরা আহকাফ : ১৫

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ-

'ওরাই তারা, আমি যাদের সৎ আমলগুলো কবুল করি এবং মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করি। তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' সূরা আহকাফ : ১৬

নবিগণ পাপ থেকে মুক্ত

নবিদের সম্পর্কে আলিমগণ বলেন—'তাঁরা পাপ থেকে মুক্ত।' আর নিশ্চিত পাপ থেকে সিদ্দিকিন, শুহাদা, সালেহিন মুক্ত নন। তবে ইজতিহাদি বিষয়গুলোতে তাঁরা কখনো সঠিক সিদ্ধান্ত নেন, কখনো-বা ভুল সিদ্ধান্ত নেন।

ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে তার জন্য দুটি প্রতিদান, আর ভুল হলে ইজতিহাদ করার জন্য একটি প্রতিদান পাবেন। তাঁদের ভুলটি ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

পথভ্রষ্ট লোকেরা ভুল করা মানেই পাপ মনে করে। কখনো এই বলে বাড়াবাড়ি করে বসে যে, সাহাবি ও ইমামগণ পাপমুক্ত বা মাসুম। আবার কখনো তাঁদের ওপর জুলুম করে বলে, তাঁরা ভুল করে বাগিতে পরিণত হয়েছেন। তবে জ্ঞানীগণ তাঁদের নিষ্পাপও মনে করেন না, আবার পাপিষ্ঠও মনে করেন না।

বিদআতি ও পথভ্রষ্টরা কেন সালাফদের ফাসিক মনে করে

উল্লিখিত বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অনেক বিদআতি ও পথভ্রষ্ট ফেরকা তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ সালাফদের গালি দেয় এবং লানত করে। কারণ, তারা বিশ্বাস করে, সালাফগণ গুনাহ করেছেন। আর যে গুনাহ করে, সে লানতের যোগ্য। তাদের কেউ কেউ তো সালাফদের ফাসিক কিংবা কাফিরও মনে করে; যেমনটা খারেজিরা করে। তারা আলি (রা.) ও উসমান (রা.)-কে কাফির মনে করে এবং এই দুজন যাদের নিযুক্ত করেছেন, তাঁদেরও কাফির মনে করে। তাঁদের সবাইকে খারেজিরা লানত করে, গালি দেয় এবং তাঁদের হত্যা করা বৈধ মনে করে। নাউজুবিল্লাহ!

খারেজিদের সম্পর্কে কতিপয় হাদিস

এরাই সেই লোক, যাদের সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন—

> ‘তোমাদের মধ্যে এমন লোক হবে, যারা তোমাদের সাথে নামাজ-রোজা আদায় করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করাকে অপমানজনক মনে করবে। কুরআন তাদের গলা দিয়ে নামবে না। তির যেভাবে ধনুক থেকে বের হয়, ইসলাম থেকে তারা সেভাবে বের হয়ে যাবে।’

রাসূল ﷺ আরও বলেন—

> ‘মুসলমানদের একটি দল বের হয়ে মুসলমানদের একটি দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তাদের হক বা সত্যের খাতিরে হত্যা করবে দুই দল থেকে উত্তম একটি দল।’

এরাই সেই খারেজি, যারা আলি (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং তাঁকে ও তাঁর নিযুক্ত সকল প্রশাসককে কাফির মনে করত।

দুজন খলিফা যখন যুদ্ধ করে, তখন একটি অভিশপ্ত

প্রকৃত অর্থে এটা বানোয়াট, মিথ্যা কথা। এমন কোনো হাদিস ইলমে হাদিসের কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিই বর্ণনা করেন না। ইসলামের নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থেও এটা বর্ণিত হয়নি।

মুয়াবিয়া (রা.) খিলাফতের দাবিতে আলি (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি

মুয়াবিয়া (রা.) খিলাফতের দাবি করেননি এবং আলি (রা.)-এর সাথে যুদ্ধের সময় তিনি খিলাফতের জন্য জনগণের নিকট থেকে বাইয়াতও গ্রহণ করেননি। নিজেকে খলিফা মনে করে তিনি এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। তিনি নিজেকে খিলাফতের হকদারও মনে করতেন না। মুয়াবিয়া (রা.)-কে কেউ এ কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি তা অকপটেই স্বীকার করতেন। এমনকী মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর সাথিবর্গ কখনোই এমনটা ভাবেননি যে, তাঁরা আলি (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করবেন এবং জয় করবেন।

বরং আলি (রা.) ও তাঁর সাথিবর্গ মনে করতেন, আলি (রা.)-এর হাতে বাইয়াত নেওয়া এখন ওয়াজিব। কেননা, মুসলিমদের দুজন খলিফা থাকাটা কিছুতেই কাম্য নয়। মুয়াবিয়া (রা.)-এর সমর্থকগণ আলি (রা.)-এর আনুগত্য থেকে বের হয়ে একটি ওয়াজিব পালন থেকে নিজেদের বিরত রেখেছে। আর অপরপক্ষের লোকেরা ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দরুন তাঁদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে এই ওয়াজিব পালনের প্রতি আগ্রহী করে তোলাকে উপযুক্ত কৌশল বলে মনে করেছেন—যাতে করে 'ইতায়াত' ও 'জামায়াত' তথা আনুগত্য ও একতা ফিরে আসে।

মুয়াবিয়া (রা.)-এর সমর্থকগোষ্ঠীর বক্তব্য হলো—আলি (রা.)-এর আনুগত্য তাঁদের জন্য ওয়াজিব নয়। তাঁদের ওপর যখন হামলা করা হয়, তখন তাঁরা মজলুম ছিল। অর্থাৎ তাঁদের ওপর হামলাটি ছিল নিতান্তই জুলুম। কারণ, উসমান (রা.)-এর হত্যাটা সকল মুসলিমের মতেই একটা জুলুম ছিল। আর আলি (রা.)-এর সৈন্যদল যখন অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল,

তখন তাঁদের লোকেরাই এই হত্যাটা করেছে। আমরা যখন আলি (রা.)-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করলাম, তখন হামলাকারীরা আমাদের ওপর জুলুম ও অবিচার করেছে। আলি (রা.)-এর পক্ষে তাদের দমন করা সম্ভব হয়নি। যেমনিভাবে উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের দমন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই আমাদের উচিত এমন একজন খলিফার কাছে বাইয়াত নেওয়া, যে আমাদের ওপর ইনসাফ করার সক্ষমতা রাখে।

আলি (রা.) ও উসমান (রা.) সম্পর্কে কিছু মিথ্যা ধারণা

উভয়পক্ষের কিছু জাহেল উসমান ও আলি (রা.) সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করেছে। (আল্লাহ তাঁদের দুজনকে সেই মিথ্যা থেকে বাঁচান)। তারা বলে—'আলি (রা.) উসমান (রা.)-কে হত্যার আদেশ দিয়েছেন।' আলি (রা.) যদিও কোনো প্রকার কসম খাওয়া ব্যতীতই সত্যবাদী, তবুও তিনি কসম খেয়ে বলতেন, তিনি এই হত্যা করেননি এবং এই হত্যায় তাঁর কোনো মত ছিল না এবং এই হত্যায় তাঁর কোনো সহযোগিতাও ছিল না।

নিঃসন্দেহে এটা আলি (রা.)-এর বহুল প্রচলিত একটি উক্তি। এই কথার ওপর তাঁর অনুসারী ও শত্রুগণ দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। তাঁর ভক্তরা এ থেকে প্রেরণা পায় উসমান (রা.)-কে কলুষিত করার। তাঁরা মনে করে, তিনি হত্যাযোগ্য। তাঁকে হত্যা করা উচিত। আলি (রা.) তাঁকে হত্যার আদেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে আলি (রা.)-এর শত্রুরা তাঁকে এই বলে দোষারোপ করে যে, তিনি নির্যাতিত খলিফা উসমান (রা.)-কে হত্যার আদেশ দিয়েছেন। উসমান (রা.) আত্মসংবরণ করেছেন। নিজেকে বাঁচাতে তিনি কোনো মুসলিমকে হত্যা করেননি। অতএব, আলি (রা.)-এর আনুগত্যের কোনো প্রশ্নই আসে না।

এ জাতীয় বহু বিষয় তাঁদেরকে উসমানিয়া ও আলাওইয়্যা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হতে প্ররোচিত করেছে।

সর্বসম্মতভাবে মুয়াবিয়া (রা.) আলি (রা.)-এর সমকক্ষ নন

এ দলগুলোর সবাই একটি বিষয়ে একমত যে, মুয়াবিয়া (রা.) খিলাফতের ক্ষেত্রে আলি (রা.)-এর সমকক্ষ নন। তাহলে আলি (রা.)-এর খলিফা হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আরেকজন খলিফা নির্বাচন করা জায়েজ

হয় কীভাবে? কেননা, আলি (রা.)-এর বিদ্যা-বুদ্ধি, সাবিকিয়্যাত (ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তিতা) পরহেজগারিতা ও সাহসিকতাসহ তাঁর যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব তাঁদের কাছে স্পষ্ট ছিল: যেমনিভাবে আবু বকর, উমর, উসমান (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত ছিল।

তিনি ও সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ছাড়া আহলে শূরার আর কেউ জীবিত ছিলেন না। সাদ (রা.) এসব বিষয় থেকে নিজেকে সব সময় দূরে রাখতেন। তাই অবধারিতভাবেই উসমান ও আলি (রা.)-এর ওপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। উসমান (রা.)-এর ইন্তেকালের পর খিলাফতের একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী বা সহযোগী রয়ে গেলেন আলি (রা.)। তবে বিপত্তির উদয় হলো তখনই, যখন উসমান (রা.)-কে হত্যা করা হলো। তাঁর মৃত্যুতে জালিম ও শত্রুশিবিরের লোকেরা শক্তিশালী হয়ে উঠল। জ্ঞানী ও ঈমানদার লোকেরা দুর্বল হয়ে পড়ল। পরস্পরে বিভেদ-বিভাজন দেখা দিলো। যার ফলে দেখা গেল, লোকেরা যোগ্য লোকের বদলে অযোগ্য লোকের কথা শুনতে লাগল।

এজন্য আল্লাহ একতা ও সম্প্রীতির প্রতি খুব জোর দিয়েছেন। একই সঙ্গে বিভেদ-বিভাজন থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তাই বলা হয়, বিভেদমূলক কাজে একমত হওয়ার চেয়ে দলবদ্ধভাবে অপছন্দনীয় কাজ করাও শ্রেয়।

আম্মার (রা.)-কে হত্যাসংক্রান্ত বুখারির হাদিসটি কি সহিহ

'নিশ্চয়ই আম্মারকে একদল বাগি হত্যা করবে'—হাদিসটি যদিও ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিমে এনেছেন, তবুও একদল এর ওপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। উক্ত হাদিসটি বুখারিতেও এসেছে।[১০৭]

---

[১০৭]. বুখারি শরিফে বর্ণিত হাদিসটি সম্পর্কে এখানে কিছু কথা বলা খুবই জরুরি।

ক. ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এখানে হাদিসটির একটি অংশ উল্লেখ করে বিপক্ষের মতাদশর্কে খণ্ডন করেছেন। তবে হাদিসটির পরবর্তী অংশটিও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতার্দশকে মজবুতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। পরবর্তী অংশটি হলো—'আম্মার (রা.) তাদের জান্নাতের প্রতি আহ্বান করবে, আর তারা (বাগিরা) আম্মার (রা.)-কে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে।' স্বভাবতই এখানে প্রশ্ন ওঠে—যারা আম্মার (রা.)-কে হত্যা করেছে, তারা কি তাহলে

কেউ কেউ এই হাদিসটির ভিন্ন ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এখানে বাগি দ্বারা মূলত সেসব বাগি উদ্দেশ্য, যারা উসমান (রা.)-এর রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছিল। যেমন : তারা উসমান (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলত—'আমরা আফফানের বেটাকে আমাদের বর্শার অগ্রভাগে দেখতে চাই।'

যাহোক, এসব অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা, রাসূল ﷺ যা বলেছেন, তা যথার্থই সত্য। আর 'আম্মারকে একদল (অবাধ্যাচারী বিদ্রোহী) বাগি দল হত্যা করবে'—কথাটা দ্বারা আমরা ইতঃপূর্বে যা প্রমাণ করেছি

জাহান্নামি? নচেৎ তারা আম্মার (রা.)-কে কেন জান্নাতের বদলে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে?

এর উত্তরে ইবনে কাসির (রহ.) বলেন—'এখানে জান্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উম্মাহর ঐক্য। আর জাহান্নাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উম্মাহর বিভাজন *(আল বিদাআ ওয়ান নিহায়া : ৪/৫৩৮)*।' অর্থাৎ আম্মার (রা.) তাদের ঐক্যের (আলি রা.-এর আনুগত্য করার) প্রতি আহ্বান করবেন, আর তারা আম্মার (রা.)-কে বিভাজনের প্রতি তথা ইমামের আনুগত্য না করার প্রতি আহ্বান করবেন। আর এটা তারা করেছিলেন নিজস্ব ইজতিহাদের আলোকে। ইসলামে ইজতিহাদ বৈধ। সেই বিবেচনায় সাহাবিদের একটি দলের সম্মিলিত ইজতিহাদ নিয়ে তো সন্দেহ পোষণের কোনো অবকাশই নেই। তা ছাড়া কুরআন মাজিদেও বিভাজনের ফলাফলকে জাহান্নাম বা অগ্নিকুণ্ডের সাথে তুল্য বিবেচনা করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য আলে ইমরান : ১০২-৬) যাই হোক, এই হাদিসের মাধ্যমে রাসূল ﷺ যেন কিছুটা স্পষ্টভাবেই বলে দিলেন, কোন দলটি বেশি সঠিক।

খ. 'নিশ্চয়ই আম্মারকে একদল বাগি হত্যা করবে'—বুখারি শরিফে বর্ণিত হাদিসের এই অংশটি সম্পর্কে বড়ো বড়ো মুহাদ্দিসিন ও ইমামগণের আপত্তি রয়েছে। ইমাম হামিদি (মৃ.-৪৮৮ হি.) তাঁর *আল জামউ বইনাস সাহিহাইন* গ্রন্থে (২/৪৬২), ইমাম বাইহাকি (মৃ.-৪৫৮ হি.) তাঁর *দালাইলুন নবুওয়াহ* গ্রন্থে (২/৫৪৬), ইমাম ইবনুল আসির (মৃ. ৬০৬ হি.) তাঁর *জামিউল উসুল* গ্রন্থে (৯/৪৩), ইমাম মিজ্জি (মৃ-৭৪২ হি.) তাঁর *তুহফাতুল আশরাফ* গ্রন্থে (৩/৪২৭), ইমাম জাহাবি (মৃ.-৭৪৮ হি.) তাঁর *তারিখুল ইসলাম* গ্রন্থে (২/৯), ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (মৃ.-৮৫২ হি.) তাঁর *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে (১/৫৪২) বলেছেন, হাদিসের এই অংশটি বুখারির মূল নুসখায় নেই। ইবনে হাজার বলেন—'কতিপয় মুহাদ্দিস মনে করেন, এই অংশটিকে ইমাম বুখারি (রহ.) লেখার পর মুছে দিয়েছেন। কারণ, এই অংশটুকু তাঁর হাদিস গ্রহণের শর্তমতে সিদ্ধ নয়।' ইমাম জাহাবি বলেছেন—'এই অংশটি বুখারিতে যদিও নেই, তবুও তা প্রমাণসিদ্ধ।'

(তথা উভয়পক্ষের লোকেরাই মুমিন ছিলেন), তা মিথ্যা কিংবা অসত্য প্রমাণিত হয় না। কারণ, আল্লাহ নিজেই বলেছেন—

وَاِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ-

'যদি মুমিনদের দুটি দল মারামারি করে, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অন্য দলের ওপর বাড়াবাড়ি (বাগাওয়াত) করে, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি (বাগাওয়াত) করবে, তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়বে; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে (আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়)। যদি ফিরে আসে, তাহলে তোমরা উভয়ের মধ্যে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং সুবিচার করবে। আল্লাহ তো সুবিচারকারীদেরই ভালোবাসেন।' সূরা হুজুরাত : ৯

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ-

'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পরে ভাই। তাই তোমাদের ভাইদের মাঝে তোমরা সন্ধি করে দাও।' সূরা হুজুরাত : ১০

এখানে পরস্পরে হত্যা ও বাগাওয়াত বা বাড়াবাড়ির উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তাদের সকলকে মুমিন ও ভাইরূপে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আল্লাহ বাগি বা বাগাওয়াতকারী দলের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাদের মুমিন হিসেবে গণ্য করেছেন। সর্বোপরি একজন সাধারণ মানুষের অবাধ্যতা, বাগাওয়াত, জুলুম ও শত্রুতা যখন তাকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না এবং তার ওপর লানত বর্ষণ করাকে ওয়াজিব করে না, তখন কীভাবে একজন 'খাইরুল কুরুন' তথা 'সর্বোত্তম সময়ের মানুষকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেবে এবং তার ওপর লানত করাকে আবশ্যক করবে?

বাগির প্রকারভেদ

এখানে একটা বিষয় জানা দরকার যে জালিম, বাগি, অতিরঞ্জনকারী কিংবা পাপাচারী—এরা প্রত্যেকেই দুই ভাগে বিভক্ত।

এক. ব্যাখ্যা সাপেক্ষ এবং

দুই. ব্যাখ্যাহীন।

যাদের অসংগত আমলের ব্যাখ্যা রয়েছে, তারা হলেন মুজতাহিদ। ইলম ও দ্বীনের বিষয়ে আন্তরিক যে বিশেষজ্ঞগণ ইজতিহাদ করেছেন, তাদের একদল কিছু জিনিসকে হালাল মনে করেছেন, অপরদল সে জিনিসগুলোকে হারাম মনে করেছেন। যেমন : কতিপয় মুজতাহিদ মদের কিছু প্রকারকে হালাল বলেছেন। আবার কতিপয় মুজতাহিদ কিছু সুদি কারবারকে বৈধ জ্ঞান করেছেন। এ জাতীয় কাজ বড়ো বড়ো সালাফদের নিকট থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। এরা হলেন ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বাগি। তারা নিজেদের সিদ্ধান্তে ভুলের শিকার হয়েছেন। আর কুরআনে এসেছে—

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا-

'হে আল্লাহ! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করে বসি, তাহলে আমাদের পাকড়াও কোরো না।' সূরা বাকারা : ২৮৬

সহিহ হাদিসে এই দুআটির কবুল হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০৮]

এক্ষেত্রে সোলাইমান (আ.) ও দাউদ (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত একটি শস্যক্ষেত্র নিয়ে বিচারের বিখ্যাত ঘটনাটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের দুজনের প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যদিও প্রশংসা করেছেন, তবুও একজনকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে বিশেষত্ব দান করেছেন। আলিমদের বিষয়টিও অনুরূপ। কারণ, তাঁরা নবিদের উত্তরসূরি। তাই তাঁরা একজন একটি মাসয়ালায় যা বুঝেছেন, অপরজন তা বোঝেননি। এতে তাঁদের নিন্দা করা যাবে না এবং তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও একনিষ্ঠতায় এটা কোনো প্রভাব ফেলবে না।

---

১০৮. মুসলিম : ১২৫

তবে গুনাহ জেনেও কেউ যদি ভিন্ন হুকুম দেয়, তাহলে সে গুনাহের শিকার হবে এবং জালিম বলে বিবেচিত হবে। আর এর ওপর লাগাতার আমল করে ফাসিক বিবেচিত হবে। অধিকন্তু কেউ যদি কোনো আমলকে নিশ্চিত গুনাহ জেনেও তাকে হালাল মনে করে, তাহলে তা কুফরি কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাগির গুনাহ মাফ হয়

বাগি যদি মুজতাহিদ হয় এবং সে নিজেকে বাগি মনে না করে; বরং হকের অনুসারী মনে করে (যদিও তার এই মনে করাটা ভুল হয়), তবে তাকে 'গুনাহকারী বাগি' বলে আখ্যায়িত করা হবে না। তাই তার ফাসিক হওয়াটা কখনো সম্ভব না।

'ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বাগিদের সাথে যুদ্ধের কথা যারা বলেন, তাদের বক্তব্য হলো—'আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দিই, যাতে তাদের বাগাওয়াত বা অবাধ্যতা সমাজে বিশৃঙ্খলা বা ব্যাপক ক্ষতির প্রাদুর্ভাব ঘটাতে না পারে। তাদের কৃত কাজকে অপরাধ মনে করে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না; বরং (তাদের কাজের অনিবার্য বিরূপ প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে কিংবা অন্য কোনো প্রক্রিয়ায়) শত্রুপক্ষ যেন রাষ্ট্রের শান্তি ও সংহতি নষ্ট করার সুযোগ না পায়, সেজন্যই যুদ্ধ করা হচ্ছে।'

তাঁরা আরও বলেন—'এই প্রকার বাগিদের 'আদালত' বা সত্যনিষ্ঠতা অক্ষত থাকবে। তাদের চরিত্রে এই কাজের জন্য কোনো প্রকার অভিযোগ আরোপ করা হবে না। তারা ফাসিক নন। তারা 'গাইরে মুকাল্লাফদের' (যাদের ওপর শরিয়তের হুকুম আরোপ হয় না।) অনুরূপ। অর্থাৎ শিশু, উন্মাদ, বিস্মৃতিপরায়ণ, বেহুঁশ ও ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো গাইরে মুকাল্লাফদের যেমন অরাজক কর্মকাণ্ড করতে বাধা দেওয়া হয়ে থাকে, তেমনি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বাগিদের অরাজক কাজেও বাধা দিতে হবে। এমনকী চতুষ্পদ প্রাণীকেও বাধা দিতে হবে। কুরআনের আয়াত অনুযায়ী—কেউ যদি ভুলবশত কাউকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে তার ওপর দিয়াত ওয়াজিব হবে; যদিও হত্যাকারী গুনাহগার হবে না। আবার হদ্দ তথা দণ্ডপ্রাপ্য ব্যক্তি যদি তওবা করে, হাদিস অনুযায়ী তার তওবা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে।

প্রসঙ্গত 'ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বাগি'-কে ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ (রহ.)-এর মতে দোররা মারা হবে।

আর বাগি যদি 'ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বাগি' না হয় তথা নিরেট বাগি হয়, তাহলে সে গুনাহগার বিবেচিত হবে। আর গুনাহ বিভিন্ন ওসিলার মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। ভালো কাজ ও বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের গুনাহকে মাফ করে দেন।

আম্মার (রা.) সম্পর্কিত হাদিসে মুয়াবিয়া (রা.)-এর নাম নেই

আম্মার (রা.)-এর হত্যা সম্পর্কিত আলোচ্য হাদিসটিতে মুয়াবিয়া (রা.) ও তাঁর অনুসারীদের কোনো উল্লেখ নেই। এই হাদিসে সম্ভবত ওই গোষ্ঠীটির কথা বলা হয়েছে, যারা আম্মার (রা.)-কে হত্যার জন্য প্রলুব্ধ হয়েছে এবং তাঁকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়েছে। এরা হচ্ছে সেনাবাহিনীর ক্ষুদ্র একটি দল। যারা আম্মার (রা.)-এর হত্যাকে সমর্থন করে, তারাও ওই ক্ষুদ্র সেনাদলটির পরিণাম ভোগ করবে। আর এটা জানা কথা, পুরো বাহিনীতে এমন সদস্য অনেক ছিল, যারা এই হত্যাকে মোটেই সমর্থন করেনি। যেমন : আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)সহ কিছু সাহাবি; বরং বলা ভালো, সবাই আম্মার (রা.)-এর হত্যায় অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এমনকী মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস (রা.)ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

বর্ণিত আছে, আম্মার (রা.)-কে যারা হত্যা করেছেন, তাদের বদলে যারা তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে হাজির করেছেন, তাদেরই মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর হত্যার জন্য দায়ী করেছেন। মুয়াবিয়া (রা.)-এর বক্তব্যকে আলি (রা.) প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—'তাহলে তো হামজা (রা.)-এর হত্যাকারী আমরা সবাই! 'কারণ, তাঁকে তো মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে সকল মুসলিমই হাজির করেছিলেন।'

এখানে আলি (রা.)-এর বক্তব্য নিঃসন্দেহে সঠিক। তবে কেউ যদি ওইসব বাহাসকারী আলিম—যাদের মাঝে যুদ্ধ ও রাজত্বের বিষয় নিয়ে কোনো বিরোধ নেই, তাদের বক্তব্যের ওপর নজর দেয়, তাহলে দেখা যাবে—মুয়াবিয়া (রা.)-এর চেয়ে ঢের দুর্বল মতামত ও ব্যাখ্যা তাদের রয়েছে। তা ছাড়া এমন ব্যাখ্যা (মুয়াবিয়া রা.-এর ব্যাখ্যাটি) যিনি করেছেন, তিনি নিজেকে আম্মার (রা.)-এর হত্যাকারী মনে করবেন না। তাই সে কিছুতেই নিজেকে বাগি হিসেবে বিশ্বাস করবে না। আর যে নিজের বাগি হওয়ার বিষয়টি অবিশ্বাস করে, সে কার্যত বাগি হলেও তাকে ব্যাখ্যাগত ভুলের শিকার বা ভুল ইজতিহাদ করেছেন বলে ধরা হবে।

জ্যেষ্ঠ সাহাবি ও ফুকাহাদের অভিমত

সাহাবি ও ফুকাহাদের কেউ-ই আম্মার (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলেন না। এ ব্যাপারে জ্যেষ্ঠ সাহাবিদের দুটো প্রসিদ্ধ মত পাওয়া যায়। একদল আম্মার ও তাঁর দলের সাথে যুদ্ধে শরিক হওয়ার কথা বলেন। আরেক দল এরূপ যুদ্ধের সর্বত বিপক্ষে। এই দুই দলেই বড়ো বড়ো অগ্রগণ্য সাহাবি রয়েছেন। তাই দেখা যাচ্ছে, প্রথম দলে রয়েছেন আম্মার, সাহল ইবনে হুনাইফ ও আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)। আর দ্বিতীয় দলে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা, উসামা ইবনে জায়েদ ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর মতো বড়ো বড়ো সাহাবিগণ। খুব সম্ভবত বড়ো বড়ো সাহাবিদের অধিকাংশই ছিলেন এই দলে; অর্থাৎ এই যুদ্ধের বিপক্ষে। উভয় দলে আলি (রা.)-এর পর সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ সাহাবি আর কেউ ছিলেন না। আর তিনি ছিলেন যুদ্ধের বিপক্ষে।

আম্মার (রা.)-এর হাদিস দিয়ে ভুল দলিল প্রদান

আম্মার (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসটি যুদ্ধের সপক্ষের লোকেরা নিজেদের পক্ষে দলিল দিয়ে থাকে। কারণ, যদি আম্মার (রা.)-কে একদল বাগি হত্যা করে, তাহলে আল্লাহর কথা—'যারা বাগাওয়াত করে, তাদের হত্যা করো' (সূরা হুজুরাত : ৯)-এর ওপর আমল করা সহজ হয়ে যাচ্ছে। আর যারা যুদ্ধ থেকে বিরত ছিল, তাঁদের দলিল হলো রাসূলের সহিহ হাদিস—

> 'ফিতনার সময় যুদ্ধের চেয়ে উত্তম হলো যুদ্ধ না করে ফিতনা থেকে দূরে থাকা।'[১০৯]

আর তাঁরা মনে করতেন, এটা ফিতনার যুদ্ধ। কেননা, এ ব্যাপারে বহু সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ এই ফিতনার মুহূর্তে যুদ্ধ করার আদেশ দেননি এবং পছন্দও করেননি; বরং তিনি এই মুহূর্তে সন্ধি করাকেই পছন্দ করেছেন। আল্লাহ তায়ালাও এই মুহূর্তে যুদ্ধ করার কোনো আদেশ দেননি; বরং তিনি আদেশ দিয়েছেন—মুসলিমদের দুপক্ষের মাঝে যারা বাগাওয়াত করবে এবং সন্ধি করতে সম্মত হবে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। যেমন : আল্লাহ বলেন—

---

[১০৯]. বুখারি : ৭০৮১

> 'যদি মুমিনদের দুটি দল মারামারি করে, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অন্যদলের ওপর বাড়াবাড়ি (বাগাওয়াত) করে, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করবে, তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়বে; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে (আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়)। যদি ফিরে আসে, তাহলে তোমরা উভয়ের মধ্যে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং সুবিচার করবে। আল্লাহ তো সুবিচারকারীদেরই ভালোবাসেন।' সূরা হুজুরাত : ৯

সুতরাং প্রথম যারা যুদ্ধ শুরু করেছে, তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছে। অর্থাৎ প্রথম আক্রমণের ব্যাপারে আল্লাহর অনুমোদন নেই। এমনকী আল্লাহ বাগাওয়াতের (জুলুমের) শিকার সকল ব্যক্তিকে অনুমোদন দেন না বাগাওয়াতকারীকে হত্যা করার। কেননা, যেকোনো বাগাওয়াতকারীকেই হত্যা করাটা কুফরি। প্রকৃত অর্থে, অধিকাংশ মুমিনই বাগাওয়াত করে থাকে; বরং অধিকাংশ মানুষই কোনো না কোনো অনাচার ও বাগাওয়াতে লিপ্ত। কিন্তু যখন মুমিনদের দুটি দল যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তখন আবশ্যক হলো তাদের মাঝে সন্ধি করে দেওয়া। আর যদি দুটি দলের একটিকেও যুদ্ধের আদেশ দেওয়া না হয়, তখন আক্রমণকারী দলটি বাগি সাব্যস্ত হবে এবং তাদের হত্যা করা হবে। কেননা, আক্রমণকারী দলটি যুদ্ধ প্রত্যাখ্যান করে সন্ধির পথ অবলম্বন করেনি। সুতরাং বাগি দলটির ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাঁচার একটিই উপায়—তাদের সাথে যুদ্ধ করা, তাদের হত্যা করা। তাই এই দলটিকে হত্যা করা দ্বিতীয় দলের জন্য কোনো আক্রমণকারীকে হত্যার অনুরূপ হবে, তথা আত্মরক্ষা হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা, এখানে আক্রমণ বা জুলুম থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো হত্যা করা। যেমনটা রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'যে লোক নিজের সম্পদ বাঁচাতে গিয়ে নিহত হয়েছে, সে শহিদ। যে নিজেকে বাঁচানোর জন্য নিহতে হয়েছে, সেও শহিদ। যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য নিহত হয়েছে, সেও শহিদ এবং যে নিজের সম্মান রক্ষার জন্য নিহত হয়েছে, সেও শহিদ।'[১১০]

---

[১১০]. আবু দাউদ : ৪৭৭২, তিরমিজি : ১৪২১

অতএব, আলি ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার যুদ্ধের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সেনাদলকে যখন বাগি সাব্যস্ত করা হচ্ছে, তখনও যুদ্ধ ও হত্যার বদলে প্রথমে সন্ধির বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তবে 'তাঁরা আগে হামলা করেছে'—এই অজুহাতেও আলি (রা.)-এর পক্ষের লোকদের হত্যা করা জায়েজ নেই। কারণ, আলি (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ থেকে পলায়নকারী লোকও ছিল, যারা আলি (রা.)-এর বেশি বিরোধিতা করত; এরা দুর্বল অনুসারী ছিল।

মোটকথা, এই হাদিসটি কিছুতেই কোনো সাহাবিকে অভিশাপ ও লানত করার বৈধতা দেয় না। এমনকী কাউকে ফাসিক সাব্যস্ত করারও বৈধতা দেয় না।

আহলে বাইত বা নবিপরিবারের কেউ কখনো গালি দেয়নি, আলহামদুলিল্লাহ!

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বনু হাশিমের কাউকে হত্যা করেনি

হাজ্জাজ বনু হাশিমের কাউকে হত্যা করেনি। তবে সে আরবের অভিজাত লোকদের হত্যা করেছে। সে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.)-এর মেয়েকে বিয়ে করেছিল। তা বনু হাশিম, বনু আবদে মানাফ ও বনু উমাইয়ার লোকেরা পছন্দ করেনি। এমনকী তাঁরা তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদও ঘটিয়েছিল। কেননা, তাঁরা হাজ্জাজকে নিজেদের 'কুফু' বা সমকক্ষ মনে করেনি। এই ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন!

পারস্পরিক যুদ্ধ-সংঘাতের সময় সন্ধি ও তার পদ্ধতি

নেককার মুসলিমদের দুটি দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে করণীয় কী

যেসব ফিতনায় নিপতিত হয়ে মানুষ একে অপরের রক্তপিপাসু হয়ে ওঠে এবং পরস্পরের সম্ভ্রমহানিতে লিপ্ত হয়, সেসব ফিতনা সবচেয়ে জঘন্য ও গুরুতর অপরাধ। আল্লাহ বলেন—

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-

‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত, ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো। অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।’ আলে ইমরান : ১০২

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

‘আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করো—যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। তোমরা

পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারো।' আলে ইমরান : ১০৩

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে সৎ কর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হলো সফলকাম।' আলে ইমরান : ১০৪

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

'আর তাদের মতো হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর আজাব।' আলে ইমরান : ১০৫

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ-

'সেদিন কোনো কোনো মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোনো কোনো মুখ হবে কালো। বস্তুত যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে—"তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গিয়েছিলে? তাহলে এবার সেই কুফরির বিনিময়ে আজাবের আস্বাদন গ্রহণ করো।"' আলে ইমরান : ১০২-৬

মুসলিমদের দুই পক্ষ পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন—

'তোমরা আমার মৃত্যুর পর কাফির হয়ো না। তখন তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে।'

অতএব, এটা একপ্রকারের কুফরি। তবে একজন মুসলিমকে গুনাহের কারণে কাফির আখ্যা দেওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন—

وَاِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-

'যদি মুমিনদের দুটি দল যুদ্ধ করে, তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অন্যদলের ওপর বাড়াবাড়ি (বাগাওয়াত) করে, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করবে, তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়ো; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে (আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়)। যদি ফিরে আসে, তাহলে উভয়ের মধ্যে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করো এবং সুবিচার করো। আল্লাহ তো সুবিচারকারীদেরই ভালোবাসেন। নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পরে ভাই। তাই তোমাদের ভাইদের মাঝে সন্ধি করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো, অচিরেই তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে।' সূরা হুজুরাত : ৯-১০

পরস্পর যুদ্ধরত মুসলিমদের সম্পর্কে আল্লাহর হুকুম হলো—'মুসলিম পরস্পরের ভাই।' তাদের মাঝে যুদ্ধ হলে প্রথম কর্তব্য হলো তাদের মাঝে সন্ধি করা। তবে তাদের কেউ যদি সন্ধিকে গ্রহণ না করে অপর দলের ওপর হামলা করে বসে কিংবা তাদের ওপর বাগাওয়াত করে বসে বা সীমালঙ্ঘন করে বসে, তাহলে এই সীমালঙ্ঘনকারীদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে সমাধান করে দিতে হবে।

সুতরাং আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসার পর তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে নিষ্পত্তি বা সন্ধির আদেশ দেওয়া হচ্ছে। তাই কেউ যদি আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে, তাহলে তার এবং তার প্রতিপক্ষের মাঝে ইনসাফভিত্তিক ফয়সালা করা হবে। সীমালঙ্ঘনকারী দলটির সাথে যুদ্ধের পূর্বে এবং উভয়পক্ষের যুদ্ধের পরে সন্ধির আদেশ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা নির্মমভাবে নির্বিচারে কোনো দলের ওপর হত্যাযজ্ঞের আদেশ দেননি।

সন্ধির পদ্ধতি

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অদেশমতে, উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে পক্ষদ্বয়ের মাঝে সন্ধি ওয়াজিব। তাদের বলা হবে—'তোমরা একে অপরের থেকে কী বদলা নেবে?' যদি কোনো দলের হত্যা ও সম্পদ লুণ্ঠন জাতীয় অন্যায় প্রমাণিত হয়, তাহলে তার ওপর জরিমানা আরোপ করা হবে। আর প্রত্যেকেই যদি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়, তাহলে কিসাসের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন : আল্লাহ বলেছেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ-

'তোমাদের ওপর হত্যার ক্ষেত্রে কিসাসকে ফরজ করা হয়েছে। স্বাধীন লোকের বিনিময়ে স্বাধীন লোক। দাসের বদলে দাস। নারীর বদলে নারী।' সূরা বাকারা : ১৭৮

সালাফদের একটি দল বর্ণনা করেছেন, এই আয়াতটি যুদ্ধমান দুটি দলের মধ্যে কিসাসের বিধানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ-

'তবে কাউকে যদি তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে মাফ করে দেওয়া হয়, তাহলে ক্ষমা হলো মহানুভবতা।' সূরা বাকারা : ১৭৮

যদি কেউ আরেকজনের ওপর মহানুভবতা দেখায়, তাহলে যথাযথ বিধি অনুসরণ করা কর্তব্য। যার ওপর কারও হক আছে, তা দিয়ে দেওয়া কর্তব্য। কেউ হক দিতে অপারগ হলে তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ তার দায়িত্ব পালন করতে পারে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনার জন্য এটা জায়েজ আছে। পরে সে তা মুসলিমদের জাকাত থেকে নিয়ে নেবে এবং সে ধনী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কাছে সহযোগিতার তলব করতে পারে। রাসূল ﷺ কবিসা ইবনুল মুখারিককে বলেন—

'হে কবিসা! মনে রেখ, তিন ব্যক্তি ছাড়া কারও জন্য হাত পাতা বা সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল নয়।

১. যে ব্যক্তি (কোনো ভালো কাজ করতে গিয়ে বা দেনার জামিন হয়ে) ঋণী হয়ে পড়েছে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত

সাহায্য প্রার্থনা করা তার জন্য হালাল। যখন দেনা পরিশোধ হয়ে যাবে, তখন সে এ থেকে বিরত থাকবে।

২. যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হয়েছে এবং এতে তার যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। তার জন্য সাহায্য চাওয়া হালাল; যতক্ষণ না তার নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়।

৩. যে ব্যক্তি এমন অভাবগ্রস্ত হয়েছে যে, তার গোত্রের তিনজন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক সাক্ষ্য দেয় যে "সত্যিই অমুক অভাবে পড়েছে", তার জন্য জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ সম্পদ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল।'[১১১]

প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের দায়িত্ব হলো—যখনই সম্ভব হয়, মুসলিমদের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা এবং আল্লাহর বিধানের নির্দেশ দেওয়া।

ধৈর্যধারণকারী মজলুমের ফজিলত

উভয়পক্ষের কেউ যদি মনে করে—সে মজলুম কিংবা তার ওপর অবিচার করা হচ্ছে, তবুও যদি সে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে সাহায্য ও সম্মানিত করবেন। সহিহ হাদিসে এসেছে—

> 'যে বান্দা ক্ষমা করে, আল্লাহ তার ইজ্জত বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়াবনত হয়, তার মর্যাদা আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেন। আর সাদাকা মালকে বাড়িয়ে দেয়।'[১১২]

আল্লাহ বলেন—

وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ-

> 'মন্দ কাজের অনুরূপ মন্দ ফল ভোগ করতে হবে। আর যে ক্ষমা করবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখবে, তার প্রতিদান আল্লাহর দায়িত্বে।' সূরা শূরা : ৪০

---

[১১১]. আবু দাউদ : ১৬৪০, মুসলিম : ১০৪৪

[১১২]. মুসলিম : ২৫৮৮

আল্লাহ আরও বলেন—

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ-

'অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যে সবর করে এবং ক্ষমা করে, তা নিশ্চয় সাহসিকতার কাজ।' সূরা শূরা : ৪২-৪৩

বাগাওয়াতকারী নিজেই নিজের পরাজয় রচনা করে

জালিম বাগাওয়াতকারী থেকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন—

'কোনো পাহাড়ও যদি আরেকটি পাহাড়ের ওপর জুলুম করে, তাহলে তাকেও অবশ্যই সমতল ভূমিতে রূপায়িত করা হবে।'

এক আরবি কবি বলেন—

'আল্লাহর বিধান হলো—বাগাওয়াত তার কর্তাকেও পরাস্ত করে। বাগির ওপর বিপদাপদের ঘনঘটা থাকে।'

কুরআনের আয়াতও একই কথা বলে—

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا-

'তোমাদের অনাচার বা বাগাওয়াত কেবল তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করবে। দুনিয়ার জীবনের আনন্দ ভোগ করে নাও।' সূরা ইউনুস : ২৩

রাসূল ﷺ বলেন—

'সীমালঙ্ঘন বা বাগাওয়াত অপেক্ষা এমন বড়ো কোনো পাপ কাজ নেই—যেটার শাস্তি দুনিয়াতে এতটা দ্রুত আপতিত হয়।

আর আত্মীয়তা রক্ষা অপেক্ষা বড়ো কোনো সৎ কাজ নেই—যেটার প্রতিদান এতটা দ্রুত দুনিয়াতে দেওয়া হয়।'[১১৩]

বাগির করণীয় কী

উভয়পক্ষের বাগি ও জালিম ব্যক্তির কর্তব্য হলো আল্লাহকে ভয় করা এবং তওবা করা। আর যে মজলুম কিংবা বাগাওয়াতের শিকার হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্যধারণ করে, তার জন্য সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ নিজেই বলেছেন—

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ-

'ধৈর্যধারণকারীদের জন্য সুসংবাদ দাও।' সূরা বাকারা : ১৫৫

আমর ইবনে আউস (রা.) বলেন—

'যারা জুলুমের শিকার হওয়া সত্ত্বেও পালটা জুলুম করে না, তাদের মনে রাখা উচিত, মুমিনদের শত্রুদের সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন—

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا-

'যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তাদের কূটচাল তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।' সূরা আলে ইমরান : ১২০

ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা যখন তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, তখন তিনি ধৈর্যধারণ করলেন এবং খোদাভীতি অবলম্বন করলেন। একপর্যায়ে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করলেন। তিনি যখন ক্ষমতার মসনদে আসীন, তখন তাঁর ভাইয়েরা সামনে এসে হাজির হলেন। তারা বললেন—

اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِيْ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا
اِنَّه مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ-

'তুমিই কি ইউসুফ নও?' তিনি বললেন—'আমি ইউসুফ। আর এ হচ্ছে আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের ওপর দয়া করেছেন।

---

[১১৩]. আবু দাউদ : ৪৯০২

যে আল্লাহকে ভয় করে এবং ধৈর্য ধরে, সে যেন জেনে রাখে—নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।' সূরা ইউসুফ : ৯০

মোটকথা, দুই পক্ষের কেউ যদি আল্লাহর বিধানাবলিকে লঙ্ঘন না করে, যথাযোগ্য ও ন্যায়সংগতভাবে তাঁকে ভয় করে এবং অপরের জুলুমের ওপর ধৈর্য ধরে, তাহলে কারও চক্রান্ত তার ক্ষতি করতে পারবে না; বরঞ্চ আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন।

ফিতনার কারণ গুনাহ ও পাপাচার

এ জাতীয় ফিতনার কারণ হলো—গুনাহ ও পাপাচার। দুই পক্ষেরই উচিত নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার ও তওবা করা, যা আজাবকে রহিত করে এবং রহমতকে অবারিত করে। আল্লাহ বলেন—

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ-

'আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদের আজাব দেবেন না এবং আল্লাহ তাদের তওবা অবস্থায় আজাব দেবেন না।' সূরা আনফাল : ৩৩

রাসূল ﷺ বলেন—

'যে লোক বেশি বেশি ইস্তেগফার করে, আল্লাহ তার সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দেন। সকল অভাব মোচন করে দেন। তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেন, যা সে কল্পনাও করেনি।'

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ- اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ- وَّ اَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ-

'আলিফ লা-ম র। এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত। অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে, যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও বন্দেগি না করো। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো। তাহলে তিনি তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশি করে দেবেন।' সূরা হুদ : ১-৩

সন্ধিতে অসম্মত দলটির সাথে করণীয়

দুটি দল—যারা নিজেদের উম্মতে মুহাম্মাদি হিসেবে দাবি করা সত্ত্বেও জাহেলি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় তথা প্রতিহিংসা ও খুনোখুনিতে লিপ্ত হয়, মুমিনরা তাদের মাঝে সন্ধি ও সম্প্রীতি স্থাপন করতে গেলে তারা প্রত্যেকেই অপরপক্ষকে যদি দোষী সাব্যস্ত করে এবং বলে—বিপক্ষের লোকেরাই প্রকৃত বাগাওয়াতকারী, তাদের নিকট থেকে আমাদের বদলা নেওয়া ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ বলেছেন—

'আমরা তাদের ওপর এ বিষয়ে ওয়াজিব করেছি যে, জানের বদলে জান...'[১১৪]

তাহলে মধ্যস্থতাকারী মুমিনদের করণীয় কী? হত্যা ও লুণ্ঠনের এই নৈরাজ্যকর অবস্থা তাদের কুফরের দিকে ধাবিত করবে। কারণ, তাদের দাবি হচ্ছে—'বিপক্ষ দলের ওপর আমাদের হক আছে। তাই যতক্ষণ আমরা তরবারির মাধ্যমে বদলা আদায় না করব, ততক্ষণ ক্ষান্ত হব না!' একপর্যায়ে দেখা গেল, একটি দল অপর দলের ওপর হামলা করে বসল। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা বাগাওয়াত ও জুলুম করল এবং মানুষদের হত্যা করল। এভাবে তারা নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টি করল। এক্ষেত্রে বাগাওয়াতকারী দলটিকে উপযুক্ত উপদেশ দেওয়ার পর তাদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদের হত্যা করা কি ওয়াজিব? কিংবা এক্ষেত্রে বাগাওয়াতকারী দলটির সাথে ইমামের করণীয় কী?

---

১১৪. প্রাগুক্ত

কিতাবুল্লাহ সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের ভিত্তিতে দুই দলের যুদ্ধ হারাম

রাসূল ﷺ বলেন—

> 'দুজন মুসলিম পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামি।' রাসূলকে প্রশ্ন করা হলো—'হত্যাকারীর বিষয়টা বুঝে এলো। কিন্তু নিহত ব্যক্তির নিয়তি এমন কেন?' তিনি বললেন—'কেননা, সেও তার ভাইকে হত্যার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।"'[১১৫]

অন্যত্র নবিজি বলেন—

> 'আমার পরে তোমরা কাফির হয়ো না। একে অপরের মুণ্ডুপাত করো না।' [১১৬]

তিনি আরও বলেন—

> 'নিশ্চয়ই তোমাদের ওপর অপরের জান ও মালকে হারাম করা হয়েছে। তোমাদের আজকের এই দেশ, এই সময়, এই মাসের হারামের মতো হারাম করা হয়েছে। শোনো, তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দেয়। হতে পারে যাদের কাছে তাবলিগ করবে, তারা অনেকে শ্রোতাদের চেয়েও অধিক ধীশক্তিসম্পন্ন থাকতে পারে।'[১১৭]

দুই পক্ষের সন্ধির পদ্ধতি

দুই পক্ষের সন্ধি ওয়াজিব। সন্ধির অনেক পদ্ধতি রয়েছে। যেমন—

- জাকাত থেকে সম্পদ সংগ্রহ করবে। সন্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য জরিমানার টাকা জাকাত সংশ্লিষ্ট সম্পদ থেকে আদায় করা বৈধ আছে। এমনটাই শাফেয়ি, হাম্বলি ও অন্যান্য মাজহাবের ফকিহগণ বলেছেন। রাসূল ﷺ কবিসা ইবনুল মুখারিক (রা.)-কে বলেন—'হে কবিসা!

---

[১১৫]. প্রাগুক্ত

[১১৬]. প্রাগুক্ত

[১১৭]. বুখারি : ৬৮, মুসলিম : ১২১৮

মনে রেখ, তিন ব্যক্তি ছাড়া কারও জন্য হাত পাতা বা সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল নয়।

১. যে ব্যক্তি (কোনো ভালো কাজ করতে গিয়ে বা দেনার জামিন হয়ে) ঋণী হয়ে পড়েছে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা তার জন্য হালাল। যখন দেনা পরিশোধ হয়ে যাবে, তখন সে এ থেকে বিরত থাকবে।

২. যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হয়েছে এবং এতে তার যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। তার জন্য সাহায্য চাওয়া হালাল, যতক্ষণ না তার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়।

৩. যে ব্যক্তি এমন অভাবগ্রস্ত হয়েছে যে, তার গোত্রের তিনজন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক সাক্ষ্য দেয়, "সত্যিই অমুক অভাবে পড়েছে", তার জন্য জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ সম্পদ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল। এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ও কারণে যদি ভিক্ষা করে বা সাহায্য প্রার্থনা করে উপার্জন করে, তা হারাম হবে।'[১১৮]

- উভয়পক্ষের লোকেরা একে অপরের রক্তপণ ও জরিমানা মওকুফ করে দেবে। আল্লাহ বলেন—

فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُه عَلَى اللهِ اِنَّه لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ-

'যে ক্ষমা করে ও সন্ধি করে, তার প্রতিদান আল্লাহর দায়িত্বে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমকে পছন্দ করেন না।' সূরা শূরা : ৪০

- উভয়পক্ষের সাথে ইনসাফের সাথে বিচার করা হবে। দেখা হবে, উভয়পক্ষের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কেমন হয়েছে। কিসাসের ভিত্তিতে স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারীর বদলা নেওয়া হবে। আর কোনো পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি যদি বেশি হয়,

---

১১৮. প্রাগুক্ত

তাহলে মহানুভবতার অনুসরণ করতে হবে এবং উত্তমরূপে তা আদায় করতে হবে। আর যদি নিহতের সংখ্যা কিংবা মালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে জানা না যায়, তাহলে এই অজ্ঞাত ক্ষয়ক্ষতি ধরা যাবে না। তবে কোনো দল যদি অধিক ক্ষয়ক্ষতির দাবি করে, তাহলে অপরপক্ষকে তা কসম করে অস্বীকার করতে হবে কিংবা অভিযোগকারী দল দাবির পক্ষে দলিল হাজির করবে। আর অভিযুক্ত দল যদি কসম করতে অসম্মতি জানায়, তাহলে কসম করতে অসম্মতি জানানোর কারণে তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

প্রতিশোধ গ্রহণ করা ওয়াজিব—কথাটি মিথ্যা

যে ব্যক্তি বলে—'আল্লাহ বদলা নেওয়াকে ওয়াজিব করেছেন', সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর ওপর মিথ্যারোপ করেছে। কেননা, কেউ তার মুসলিম ভাই কর্তৃক জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কিংবা মানহানির শিকার হলে তার ওপর বদলা নেওয়াকে আল্লাহ ওয়াজিব করেননি। উপরন্তু আল্লাহ বান্দার হকের আলোচনায় সবখানেই ক্ষমা করাকে পছন্দনীয় পন্থা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন : আল্লাহ বলেন—

وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ-

> 'আঘাতসমূহের কিসাস নেওয়া হবে। তবে যদি সাদাকা করে দেয়, তাহলে সেটা তার কাফফারা বিবেচিত হবে।' সূরা মায়েদা : ৪৫

তিনি আরও বলেন—

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ-

> 'ধার্যকৃত সম্পদের অর্ধেক দেবে। তবে যদি তারা ক্ষমা করে দেয় কিংবা যার হাতে বিয়ের বন্ধন—সে যদি ক্ষমা করে দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা।' সূরা বাকারা : ২৩৭

কিসাসের আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّه وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

'আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গুনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালিম।' সূরা মায়েদা : ৪৫

এই আয়াতের বিধান বনি ইসরাইলের ওপর ফরজ করা হয়। আজও যেহেতু তা মানসুখ বা রহিত হয়নি, তাই আমরাও তা পালন করি। এর উদ্দেশ্য হলো— সকল মুসলিমের রক্তই সমান। যেমন : রাসূল ﷺ বলেন—

'সকল মুসলিমের জীবনমূল্য সমান। অন্যদের বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধ শক্তি।'[১১৯]

সুতরাং চাই হত্যাকারী উঁচু বংশের নেতাগোছের হোক, আর নিহত ব্যক্তি দুর্বল ও নিম্ন শ্রেণির হোক কিংবা হত্যাকারী চাই হাশেমি আর নিহত ব্যক্তি কুরাইশের হোক—বিধান কখনোই পরিবর্তিত হবে না। সবার জীবনমূল্য সমান।

মূলত এর উদ্দেশ্য হলো—জাহেলি যুগে প্রচলিত বিধিকে রহিত করা। জাহেলি যুগে প্রথা ছিল—গোত্রের বড়ো কোনো ব্যক্তি যদি নিহত হয়, তাহলে হত্যাকারীর গোত্রের বদলে অন্য গোত্রের কয়েকজনকে হত্যা করা। আর যদি নিম্ন পর্যায়ের কোনো লোক নিহত হয় এবং হত্যাকারী

---

[১১৯]. আবু দাউদ : ৪৫৩০

গোত্রের উঁচু পর্যায়ের লোক হয়, তাহলে কোনো বদলা নিতে পারবে না। এসব প্রথাকে বাতিল করতে আল্লাহ বলেন—

> 'এ বিষয়ে আমরা তাদের ওপর জানের বদলে জান ফরজ করেছি।'

তাই দেখা যাচ্ছে, জানের বদলে জানের বিধান কার্যকর করে সমতা বজায়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে। কারণ, কারও ওপর জুলুম করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। আর হকদারের হক বুঝিয়ে দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। যেমন : আল্লাহ বলেন—

> وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ-
>
> 'আর যে নাহকভাবে নিহত হয়েছে, তার অভিভাবককে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছি। তাই হত্যার বেলায় তোমরা বাড়াবাড়ি করো না।' সূরা বনি ইসরাইল : ৩৩

অর্থাৎ যে হত্যা করেনি, তাকে হত্যা করো না।

কোনো একটি দল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ করার পর অপর দলটি যদি বলে—'আমরা আমাদের হক নিজ হাতে আদায় করব', তাহলে এটা গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। যখন ক্ষমতাধর অপর দলটি আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর হুকুম পালনে অসম্মতি জানায়, তখন আমিরের ওপর ওয়াজিব হলো এদের হত্যা করা। তারা যদি ক্ষমতাধর না হয়, তাহলে তদন্ত করা হবে—কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর হুকুম মানতে অসম্মতি জানিয়েছে। অতঃপর তাকে ন্যায়বিচার মানতে বাধ্য করা হবে।

বহু বছরের পুরাতন বদলা বা হক কীভাবে আদায় করা হবে

কেউ যদি দাবি করে—প্রতিপক্ষের ওপর আমাদের বহু বছরের হক রয়েছে, তাহলে তাদের বলা হবে—আমরা তোমাদের মাঝে নতুন ও পুরাতন সব হকের বিষয়ে মীমাংসা করব। কারণ, আল্লাহর বিধান সব সময়ের জন্য পালন করা অপরিহার্য।

সন্ধির পর কাউকে হত্যা করা

সন্ধি ও সম্প্রীতি স্থাপিত হওয়ার পর যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারীকেও হত্যা করা হবে। অধিকন্তু আলিমদের একটি দল বলেন—তাকে হত্যা করে হদ্দ কায়েম করা হবে এবং নিহত ব্যক্তির স্বজনদের জন্য এ লোককে ক্ষমা করা জায়েজ হবে না। অধিকাংশ আলিম বলেন—তাকে হত্যা করা হবে বটে, তবে স্বজনরা মাফ করার এখতিয়ার রাখবে।

তবে এরূপ কাজ যদি পুরো দল মিলে করে, তাহলে তাদের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তাদের হত্যা করা ব্যতীত যদি তারা না ফেরে, তাহলে তাদের হত্যা করা হবে। আর যদি হত্যা করা ছাড়াই তারা ফিরে আসে, তাহলে এমন শাস্তি দেওয়া হবে—যা তাদের সীমালঙ্ঘন ও শত্রুতা থেকে এবং চুক্তি ও ওয়াদা ভঙ্গ থেকে বিরত রাখে। রাসূল ﷺ বলেছেন—

> ‘কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পশ্চাতে তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণমতো পতাকা স্থাপিত থাকবে। তারপর বলা হবে—“এটা অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।”’[১২০]

আল্লাহ বলেন—

> فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

> ‘অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ ও বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব।’ সূরা বাকারা : ১৭৮

---

১২০. প্রাগুক্ত

আলিমদের একদল বলে—ক্ষমার পরে যে হত্যা করে, তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। আরেক দল বলেন—তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে, যার ফলে সে এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকে।

নামাজ-রোজা ইত্যাদি পরিত্যাগকারীর হদ কী

যারা নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না অথবা রোজা রাখে কিন্তু নামাজ পড়ে না, মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করে আবার প্রতিবেশী ও অসহায়দের সাহায্যও করে, তাদের ধর্ম নির্দিষ্ট করে শনাক্ত করা যায় না। তাহলে তাদের হুকুম কী?

তারা যদি কোনো শাসকের অধীনে থাকে, তাহলে শাসক তাদের নামাজ কায়েমের আদেশ দেবে। যদি না করে, তাহলে শাস্তি দেবে। রোজার ক্ষেত্রেও একই কথা। তবে এটা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন তারা ফরজগুলোর ফরজিয়াত স্বীকার করবে। যদি স্বীকার না করে, তাহলে তারা কাফির। আর তারা যদি নামাজ-রোজা ইত্যাদির ফরজিয়াত স্বীকার করা সত্ত্বেও আদায় না করে, তাহলে তা আদায় করা পর্যন্ত তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। এতৎসত্ত্বেও যারা নামাজ পড়বে না, জমহুর আলিম তথা ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আহমদ (রহ.) প্রমুখের মতানুযায়ী—তাদের হত্যা করা হবে। অনুরূপভাবে হদও কায়েম করা হবে।

যদি প্রভাবশালী সম্পূর্ণ একটি দল ফরজ বিধান পালন না করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে (যেমন : জাকাত দিতে অসম্মতি জানানো দলটির বিরুদ্ধে আবু বকর (রা.) যুদ্ধ করেছিলেন); যদি না তারা সুস্পষ্ট মুতাওয়াতির ওয়াজিবগুলো পালনে ব্রতী হয়। সুস্পষ্ট মুতাওয়াতির ওয়াজিবগুলো হলো—নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাদি। যিনা, সুদ, ডাকাতি ইত্যাদি পরিত্যাগ করাও এ জাতীয় ওয়াজিবের অন্তর্গত।

যে ব্যক্তি নামাজ ও রোজাকে ফরজ মনে করবে না; অস্বীকার করবে, সে কাফির। তাকে তওবা করতে বলা হবে। তওবা না করলে হত্যা করা হবে। আর যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে না, সে তো ইহুদি-নাসারাদের চেয়েও বড়ো কাফির।

পাপাচারী সম্প্রদায় যুদ্ধে নিহত হলে কি শহিদ হবেন

সীমান্তে বসবাসকারী যেসব সম্প্রদায় শত্রুপক্ষ থেকে দেশকে রক্ষা করে এবং শরাব ও যিনায় নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, তারা যদি মারা যায়, তাহলে কি শহিদ বিবেচিত হবে?

তারা যদি কাফির শত্রুপক্ষদের ওপর হামলা করে মারা যায়, তাহলে তাদের কাজের প্রতিদান নিয়্যাতের ভিত্তিতে পাবে। একবার সাহাবিরা রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন—

> 'হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ তো বীরত্ব প্রদর্শন, জাতিস্বার্থ ও লোক দেখানোর জন্যও যুদ্ধ করে, তাহলে শহিদ কে?'

রাসূল ﷺ বললেন—

> 'যে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত রাখার জন্য যুদ্ধ করে, সে-ই শহিদ।'[১২১]

তাই কেউ যদি অর্থোপার্জন এবং তা পাপ কাজে খরচ করার জন্য যুদ্ধ করে, তাহলে সে ফাসিক এবং তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত রাখতে এবং সর্বাত্মকভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে, তাহলে সে শহিদ হবে। যদি তাদের কবিরা গুনাহ থাকে, তাহলে পুণ্যও থাকবে। আর পাপ তো পুণ্যের দ্বারা বিমোচিত হয়ে যায়।

তবে তারা যদি সেখানকার মুসলিমদের হত্যা করে, তাহলে তারা জমিনে বিপর্যয়কারী ও ফিতনা সৃষ্টিকারী লোক গণ্য হবে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে বলে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

---

[১২১]. বুখারি : ৭৪৫৮, মুসলিম : ১৫০

পাতানো ভ্রাতৃত্ব এবং আনসার-মুহাজিরদের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক

পাতানো ভ্রাতৃত্ব

বর্তমানে অনেকেই ভাই পাতিয়ে একজন আরেকজনকে বলে—'আমার সম্পদ তোমার সম্পদ এবং আমার আত্মীয় তোমার আত্মীয়। আমার সন্তান তোমার সন্তান।' এই বলে একে অপরের রক্ত পান করে। এমনটা করা কি শরিয়তসম্মত? এটা কি মুবাহ? এতে করে রক্তসম্পর্কীয় ভাইয়ের বিধান প্রযোজ্য হবে? আর মুহাজির ও আনসারদের মাঝে রাসূল ﷺ যে ভাইয়ের সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন, তা কেমন ছিল?

উল্লিখিত পদ্ধতিতে সর্বসম্মতিক্রমে ভাই পাতানো জায়েজ নেই। রাসূলের পদ্ধতিটি ছিল এমন—

> 'রাসূল ﷺ আনাস ইবনে মালিক (রা.)-এর বাড়িতে সাদ ইবনে রবিয়া ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃবন্ধন প্রতিষ্ঠা করে দেন। তখন সাদ (রা.) আবদুর রহমান (রা.)-কে বলেন—"তুমি আমার সম্পদের এক ভাগ নিয়ে যাও, আর আমার স্ত্রীদের কাউকে পছন্দ করো। তাঁকে আমি তালাক দেবো, তাহলে তুমি তাঁকে বিয়ে করতে পারবে।" তারপর আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন—"আল্লাহ তোমার মাল ও পরিবারে বরকত দিক। আমাকে বাজার দেখিয়ে দাও।"'[১২২]

---

[১২২]. বুখারি : ২০৪৯, মুসলিম : ১৪২৭

অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ সালমান ফারসি ও আবু দারদা (রা.)-এর মাঝেও ভাইয়ের সম্পর্ক গড়ে দিয়েছিলেন। এ সবই সহিহ হাদিসে এসেছে।

তবে কিছু কিছু সিরাতকার এক মুহাজিরের সাথে অন্য মুহাজিরের এবং এক আনসারের সাথে অন্য আনসারের ভাই সম্পর্কের যে বর্ণনা করেছেন, তা ভিত্তিহীন। সকল হাদিসবিশারদের মতেই তা অগ্রহণযোগ্য। মুহাজির ও আনসারদের মাঝে এই সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছিল।

وَاُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ-

'বস্তুত আত্মীয়গণই পরস্পরের বেশি হকদার।' সূরা আনফাল : ৭৫

এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর আত্মীয়তা সম্পর্ককেই মিরাসের মাপদণ্ড মানা হয়। পাতানো ভাই সম্পর্কে কোনো মিরাস নির্ণীত হয় না।

উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে একটি ইখতিলাফ রয়ে গেছে। আর সেটা হলো—যদি পাতানো সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো আত্মীয় বেঁচে না থাকে, তাহলে মিরাস পাবে কি না? ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এবং আহমদ (রহ.)-এর এক বর্ণনামতে পাবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ-

'আর যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তাদের হক তাদেরকে দিয়ে দাও।' সূরা নিসা : ৩৩

ইমাম মালেক ও শাফেয়ি (রহ.)-এর মতে এবং আহমদ (রহ.)-এর যে মতটি তাঁর অনুসারীদের কাছে প্রসিদ্ধ, সে মত অনুযায়ী—পাতানো সম্পর্কের ভিত্তিতে কিছুতেই মিরাস পাবে না। তাঁরা বলেন—উপরিউক্ত আয়াতটি মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে।

আনসার ও মুহাজিরদের মতো সম্পর্ক পাতানো কি বৈধ

এক্ষেত্রেও ইখতিলাফ রয়েছে। একদল বলেন—এ জাতীয় সম্পর্ক রহিত হয়ে গেছে। তাঁদের প্রথম দলিল মুসলিম শরিফের হাদিস।

জাবির[১২৩] (রা.) বলেন—

> 'ইসলামে কোনো পাতানো সম্পর্কের অস্তিত্ব নেই। জাহেলিয়াতের সময় যা ছিল, তার ওপর ইসলাম কেবল কঠোরতাই আরোপ করেছে।'[১২৪]

তা ছাড়া আল্লাহ কুরআনে মুমিনদের পরস্পরের ভাই হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। হাদিসেও রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার ভাইয়ের ওপর জুলুম করবে না এবং তার ভাইয়ের ওপর জুলুম হলে সহ্যও করবে না।'[১২৫]

আরেক হাদিসে নবিজি বলেন—

> 'যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না—যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যে উত্তম বিষয় পছন্দ করে, অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে।'[১২৬]

যে ঈমানের আবশ্যিক শর্ত পালন করবে, সে সকল মুমিনের ভাই। তাই কোনো প্রকার বিশেষ চুক্তি ছাড়াই তার হক আদায় করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ ও রাসূল ﷺ মুমিনদের ভ্রাতৃত্ব ও পরস্পরে দায়বদ্ধতার কথা পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছেন।

মুসলিমের ভালোবাসা, পছন্দ-অপছন্দ ও বন্ধুত্ব-শত্রুতার স্বরূপ

মুসলমানের ভালোবাসা, পছন্দ-অপছন্দ ও বন্ধুত্ব-শত্রুতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশমাফিক হতে হবে। তাই আল্লাহ ও রাসূল ﷺ যা পছন্দ করেন, তা পছন্দ করা আবশ্যক এবং যা অপছন্দ করেন, তা অপছন্দ

---

১২৩. হাদিসটি মুসলিম শরিফে জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.)-এর সূত্রে এসেছে। জাবির (রা.)-এর সূত্রে নয়; যেমনটা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন।

১২৪. মুসলিম : ২৫৩০

১২৫. বুখারি : ২৪৪২

১২৬. বুখারি : ১৩

করা আবশ্যক। একইভাবে যে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার সাথে বন্ধুত্ব রাখা এবং যে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে শত্রুতা রাখে, তার সাথে শত্রুতা রাখাও কর্তব্য। আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ভালো-মন্দ উভয় কাজেরই প্রতিদান দেওয়া হবে। যেমন : ফাসিকরা সওয়াব ও শাস্তি দুটোই পাবে। এজন্য তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা দুটোই আমলে নিতে হবে। আমলের ভেতরে থাকা সৎ কাজ ও অসৎ কাজের ভিত্তিতে তাদের পছন্দ-অপছন্দ দুটোই করতে হবে।

যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه-

'যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করে, তাকে তা দেখানো হবে এবং যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, তাকে তা-ও দেখানো হবে।' সূরা জিলজাল : ৭-৮

এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মত। খারেজি, মুতাজিলা, জাহমিয়্যাহ ও মুরজিয়াদের অবস্থান এর বিরুদ্ধে। তারা উভয়দলই এক্ষেত্রে দুটো পক্ষ নিয়ে আছে এবং তারা প্রান্তিকতার শিকার। আহলে সুন্নাহ এক্ষেত্রে মধ্যমপন্থি দল।

সম্পর্ক-চুক্তির মাধ্যমে কোনো পিতৃত্ব সাব্যস্ত হয় না

এক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ নেই যে যদি কোনো রক্তের সন্তান (জীবিত) থাকে, তাহলে অন্য কেউ কারও মিরাসি সন্তান হতে পারবে না। অর্থাৎ পাতানো সম্পর্কের ছেলে মিরাস পাবে না, যদি রক্তের সন্তান থাকে। আল্লাহ তায়ালা পালকপুত্রের জাহেলি নিয়মকে রহিত করেছেন—

مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِه وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰئِيْ تُظَاهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ-

'আল্লাহ কোনো মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। তোমাদের যে স্ত্রীদের সাথে তোমরা জিহার করো, তাদের তিনি তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদের তোমাদের পুত্র করেননি।' সূরা আহজাব : ৪

মহান আল্লাহ আরও বলেন—

اُدْعُوهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ -

'তোমরা তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে।' সূরা আহজাব : ৫

অনুরূপভাবে তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হবে না। কারণ, এটা দুই দিক থেকেই অসম্ভব। তবে তারা উভয়ে অপরের সম্মতি সাপেক্ষে সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে; যেমনটা সালাফগণ করতেন। তাঁরা একে অপরের অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকে খাবার খেতেন। কারণ, সে জানতেন যে এতে তাঁর সম্মতি আছে। যেমনটা আল্লাহ তায়ালা সূরা নুরে বলেছেন—

اَوْ صَدِيْقِكُمْ -

'অথবা তোমাদের বন্ধুগণ।' সূরা নুর : ৬১

চুক্তি কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হলে পূরণ করা আবশ্যক

সর্বোপরি সকল শর্ত, চুক্তি ও সম্পর্ক কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে যাচাই করা আবশ্যক। যদি এগুলো কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হয়, তাহলে তা পালন করতে হবে। রাসূল ﷺ বলেন—

'যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহবিরোধী শর্ত করল, তার শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে; যদি শর্ত ১০০টিও হয়। কেননা, আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে সত্য এবং তার শর্ত অধিক পালনযোগ্য।' [১২৭]

যেমন : কেউ অন্যের ছেলেকে নিজের ছেলে বলে শর্ত করল কিংবা অন্যের গোলাম আজাদ করে দিলো অথবা তার সন্তান ও আত্মীয়কে মিরাস না পাওয়ার শর্ত করল অথবা নাহকভাবে কাউকে সহযোগিতার শর্ত রাখল

---

[১২৭]. বুখারি : ২৫৬১

বা কথা দিলো—এ জাতীয় সকল শর্তের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথাই পালনযোগ্য। আল্লাহ ও রাসূলের খেলাফ কোনো কথা বা শর্ত পূরণ করা যাবে না। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। তবে মুবাহ বিষয়াদি নিয়ে মতপার্থক্য আছে। সেই আলোচনার এটা উপযুক্ত স্থান নয়।

অনুরূপভাবে ব্যবসায়িক চুক্তি, হেবা, ওয়াকফ, মান্নত, ইমাম ও মাশায়েখদের কাছে বাইয়াত, ভাই চুক্তি, বংশীয় চুক্তি ইত্যাদি সকল চুক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা আবশ্যক। আর সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। স্রষ্টার অবাধ্যতা হয়—এমন কাজে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না। আর সবচেয়ে প্রিয় হওয়া চাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। আল্লাহু আলাম!

রাষ্ট্রপরিচালনায় ইসলামের মৌলিক দর্শন কী হবে—এ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক বিদ্যমান। কেউ রাজতন্ত্রকে হারাম বিবেচনায় নিয়ে একে কেন্দ্র করে সাহাবিদেরও গালমন্দ করে বসে। আবার কিছু লোক মনে করে, রাজতন্ত্রই হলো ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম পছন্দ। দুঃখজনকভাবে উভয়পক্ষের কেউ-ই প্রান্তিকতামুক্ত নয়। এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের ভারসাম্যপূর্ণ আচরণই ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে। আহলে সুন্নাহ মনে করে—অপারগতা ও গ্রহণযোগ্য কারণ সাপেক্ষে রাজতন্ত্র কিংবা অন্য কোনো শাসনপদ্ধতি ইসলামে বৈধ। তবে ইসলাম খিলাফতকে প্রাধান্য দেয়। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় খিলাফত ও রাজতন্ত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক ও ফিকহি পর্যালোচনাই *খিলাফত ও রাজতন্ত্র* গ্রন্থের মূল ভাষ্য।